উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা
দ্বিতীয় সেমেস্টার

নাটক

কোর পত্র – ২০৩ (আবশ্যিক)

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় –ক

একক ১ - নাট্যশিল্প ও সাজাহান,প্রধান চরিত্রের তাৎপর্য।

একক ২ – ঔরংজীব জাহানারা ও অন্যান্য চরিত্র আলোচনা।

একক ৩ - নাটকে সংগীতের ব্যবহার, ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে বৈচিত্র্য, ট্র্যাজেডি বিচার।

একক ৪ – দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে নাটকের বিশ্লেষণ।

একক ৫ - বাংলা নাটকের সূচনা ও মধুসূদন।

একক ৬ – ট্র্যাজেডি, গঠনশৈলী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব।

একক ৭ - কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি

পর্যায় খ

একক ৮ - কাব্য নাটক প্রসঙ্গ ও বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা

একক ৯ - পুরাণের পুনর্জন্ম, সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব।

একক ১০ – নাটকের চরিত্র নির্মাণের বৈচিত্র্য

একক ১১ - লেখক সত্তা, সমকাল ও তুলসী লাহিড়ী

একক ১২ - চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তার

একক ১৩ - সংগীত প্রয়োগ, ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব।

একক ১৪ - কাহিনি বিন্যাস, শৈলীবিচার, সংলাপ ও ভাষার নির্মাণ।

আধুনিক বাংলা নাটক

পর্যায় - ক

একক ১ : নাট্যশিল্প ও সাজাহান,প্রধান চরিত্রের তাৎপর্য - নাটক ও নাট্যশিল্প, দেশকাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যকার পরিচিতি, দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যজীবনের নানামাত্রিক পর্যায়ক্রম, সাজাহান নাটকের প্রেক্ষাপট, নামে নামান্তরে সাজাহান, কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাযুজ্যে সাজাহান।

একক ২ : ঔরংজীব জাহানারা ও অন্যান্য চরিত্র আলোচনা - ঔরংজীবের চরিত্র আলোচনা, জাহানারার চরিত্র আলোচনা, দারা ও সুজার চরিত্রের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ, অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের প্রয়োজনীয় আলোচনা।

একক ৩ : নাটকে সংগীতের ব্যবহার, ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে বৈচিত্র্য, ট্র্যাজেডি বিচার - নাটকে সংগীতের ব্যবহার, ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে বৈচিত্র্য, ট্র্যাজেডি হিসাবে সাজাহানের উপস্থাপনা।

একক ৪ : দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে নাটকের বিশ্লেষণ।

একক ৫ : বাংলা নাটকের সূচনা ও মধুসূদন - বাংলা নাটকের সূচনা, বাংলা নাটকের আদি যুগ ও মধুসূদন, নাট্যমঞ্চ ও মধুসূদন, মধুসূদনের নাট্যাদর্শ, ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

একক ৬ : ট্র্যাজেডি, গঠনশৈলী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব – ট্র্যাজেডির আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক, গঠন ও ঘটনার বৈচিত্র্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক বিশ্লেষণ, পাশ্চাত্য প্রভাব, প্রাচ্য প্রভাব।

একক ৭ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি - গদ্যশিল্পী মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ, কৃষ্ণকুমারী নাটকের চরিত্রসৃষ্টি।

একক ১ - নাট্যশিল্প ও সাজাহান, প্রধান চরিত্রের তাৎপর্য

বিন্যাস ক্রম

১.১ নাটক ও নাট্যশিল্প

১.২ দেশকাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল

১.৩ নাট্যকার পরিচিতি

১.৪ দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যজীবনের নানামাত্রিক পর্যায়ক্রম

১.৫ সাজাহান নাটকের প্রেক্ষাপট

১.৬ নামে নামান্তরে সাজাহান

১.৭ কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাযুজ্যে সাজাহান

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.১ নাটক ও নাট্যশিল্প

নাটক হল আধুনিক ও গতিশীল শিল্পপ্রকরণ। কারণ নাটকে থাকে জীবনের অনুলিপি, দর্পনের মতো তথ্য এবং সত্যের উপস্থাপনা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দুপ্রকার – দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্যের মিলিত রূপ হিসেবে

পাঠকের সামনে ধরা দেয়। রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিরূপ কে তুলে ধরা হয়।

সাহিত্যদর্পন গ্রন্থে নাটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে - তাঁর ভিতর থেকে যে লক্ষণ গুলি ফুটে উঠেছে, তা এই রকম –

১) নাট্যবৃত্তান্ত বা কাহিনি হবে সুবিখ্যাত এবং পঞ্চসন্ধিযুক্ত।

২) নায়ক চরিত্রে বিলাস, ঋষি, প্রভৃতি গুণ থাকবে।

৩) চরিত্রের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত হবে।

৪) নানা রস থাকবে। শৃঙ্গার বা বীর রসের মধ্যে একটি অঙ্গীরস হবে,
অন্য রসগুলিও প্রকাশিত হবে। তবে নির্বহন সন্ধিতে থাকবে
অদ্ভুত রস।

৫) অঙ্ক সংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ।

৬) নাটকে চার পাঁচটি প্রধান পুরুষ থাকবে। প্রধান ব্যক্তি বা
নায়ক হবেন - বিখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত
গুণ সম্পন্ন বীর।

৭) নাটকের গঠন হবে গোপুচ্ছাগ্রভাগের মতো। অর্থাৎ গোপুচ্ছের মতন
অসমান হবে অঙ্গগুলি। নাটকের শুরুতে থাকে পূর্বরঙ্গ বা মঙ্গলাচরণ,
সভাপূজা, তারপর কবির ও নাটকের নামকথন এবং পরে প্রস্তাবনা
করতে হয়। সূত্রধার এই অংশ ঘোষণা করেন বা অভিনয় করেন।
আচার্য ভরতের মতে লোকবৃত্তের অনুকরণই নাটক।

জাতীয় জীবনে ও সংস্কৃতি জীবনে অন্যতম গতিশীল ধারা হল, নাটক। নাট্যকার দর্শকের কথা মনে রেখে সমকালীন দেশ ও কালের পটভূমিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপ দেন। তবে তা শিল্পী সত্তার মুন্সীয়ানার চিরকালীন হয়ে উঠতে পারে, - সমকালীনতার গন্ডী অতিক্রম করে। নাটক দৃশ্যকাব্য হওয়ায় নাট্যকারের উদ্দেশ্যও প্রত্যক্ষভাবে দর্শকচিত্তে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

"সাধারণের মনকে জাতিপ্রেমের উগ্র উচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হইতেছে নাটক ও অভিনয়; বহু দেশের বন্ধন মুক্তির ইতিহাসেই এই ঘটনাটি চোখে পড়ে। (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খন্ড বিশ্বভারতী, ১৯৬১ পৃষ্ঠা- ১৯০)"

নাট্যকারের জীবনভিজ্ঞতা ও সামাজিক সহানুভূতি সমাজ মানসের তাৎপর্যকে নতুনভাবে রূপ দিতে পারে নাটকের মধ্যে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা – যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে নাট্যকার ও দর্শক, ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের পীড়নে, অস্তিত্বের সংকটে তিলে তিলে অবক্ষয়ের পথে মানুষ অবক্ষয়িত হচ্ছে – তাঁর বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয় নাটকের আঙ্গিকে। যুগজীবনের দ্বন্দ্ব, রুচি-বিকৃতি, ভাবভাবনা, শীল-সদাচার, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি নাট্যকারের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

১.২ দেশকাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবকালে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত। তাঁর জন্মের কিছুদিন আগেই জাতীয়তাবোধ উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ 'সিপাহী বিদ্রোহ' ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে গুম্‌রে মরছে। জাতি নতুন মন্ত্রোপলব্ধিতে জেগে উঠেছে। জাতীয়তাবোধ তথা ভারতবোধে জাগ্রত জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতা আস্বাদের আকাঙ্ক্ষায় জাতী তখন অধীর। হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভারত-আত্মাকে আবিষ্কার করতে সমগ্র জাতির জাগ্রত চেতনা মুখর হয়ে উঠেছে। এই পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব।

এই সাধনায় জাতি কতখানি সার্থকতা লাভ করতে পেরেছিল? আমাদের মনে হয়, তার চেয়েও বড় কথা সেই সাধনায় জাতি কতখানি আন্তরিক ছিল। উনিশ শতকের মনীষী-মিছিলে এই সত্যটিই উঠেছিল প্রকট হয়ে। এই শতকের মনীষীরা তাই নতুনভাবে ভারত-আত্মার আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন –

"বৃটিশ শক্তি যখন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক ভূখন্ডকে এক রাজ্যপাশে বিধৃত করিতেছিল, তখন এইসব মনীষী কঠিন সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাব-মূর্তিকে

আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই ভাব-ভারতবর্ষই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল – ইহাই ছিল তাঁহাদের 'স্বর্গ আমার, আমার দেশ'।"

কবি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তাই যোগী ও কবির মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য। কাব্যাস্বাদকে আমাদের আলংকারিকেরা বলেছেন, ব্রহ্মস্বাদের সহোদর। আর দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যের সাধনার অন্তর্নিহিত প্রকাশ ঘটেছিল গীতিধর্মীতায়। সাহিত্য-সাধনাকে দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যের সাধনা বলে বিশ্বাস করেছেন, ভাববিলাসের উপকরণ হিসেবে নয়। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের ও স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্যে দিয়েই। তাঁর ব্যক্তিগতজীবনে উপলব্ধ সত্য ও সাহিত্যজীবনে বিশিষ্ট অনুভূতি দুটোই যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারত-আত্মার স্বরূপ আবিষ্কারের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সত্যকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আমাদের চিন্তাধারায় জড়বাদ ও যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। জাগতিক লাভ-ক্ষতিকেই আমরা পরম সত্য বলে মেনে নিতে পেরেছি। এই প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদী সমস্ত কিছুই জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়েছে। সেই দীক্ষার নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী উদ্বুদ্ধ। এই প্রথম উচ্ছ্বাসে আবেগের আতিশয্য থাকবেই, সেটাই স্বাভাবিক। তাই সেই সময়ে জাতীয়তাবাদের প্রকাশে উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা ভাবতে গিয়ে 'আমার দেশ' এই বোধেও তারা সমানভাবে হয়েছেন আকৃষ্ট।

এই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছে দুভাবে। একদিকে দেশের প্রাচীন ইতিহাস-কাহিনী, দেশের সংস্কৃতির নানা নির্দশন তাদের মনকে করেছে আলোড়িত, অন্যদিকে নবলব্ধ পাশ্চাত্য-সভ্যতার নানা মুক্ত-চিন্তার ফসল তাঁদের সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও দেখেছি, ইতিহাসের নানা কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তা প্রচার করেছেন। প্রাচীন গৌরব গাঁথা চিত্রিত করে জাতীয়তাবোধকে প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ইংরেজের কঠোর অনুশাসন এড়াতে গিয়ে ইতিহাসের কাহিনি চয়ন করার অজুহাতে উপলব্ধ সত্যকেই প্রকাশ করেছেন।

তবে অনেকেই দেশের উপলব্ধি চিত্রিত করেই থেমে থাকেন নি। আবেগের তীব্রতা কিছুটা স্তিমিত হলে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, এই স্বাদেশিকতার মধ্যেও কিছুটা

সংকীর্ণতা রয়েছে। ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত সত্যকে যদি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। নিছক দেশ ও কালের গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে অমৃতের পথে, অধ্যাত্মসাধনার উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বমানবের মিলনতীর্থে। এই সত্যোপলব্ধির প্রধান প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' আসলে ভারতমাতারই বন্দনা (বন্দে ভারতম্) এবং রবীন্দ্রনাথের অসীমের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ্বমৈত্রীতে, আন্তর্জাতিকতায়। এঁদের রচনায় যদিও জাতীয়তাবোধের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেই থেমে থাকেননি – অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন। দেশকে অস্বীকার করে নয়, দেশকে কেন্দ্র করে করে'ই এরা দেশকালতীতের সাধনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণিভুক্ত। উনিশ শতকে আমরা দেখেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চেষ্টা। ফলে দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের রূপ প্রকাশ পেয়েছে বঙ্কিম সাহিত্যে; সীমা-অসীমের লীলা রূপায়িত হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে; দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে দেখি দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধের কিংম্বা বলি, জাতীয়তাবোধ বনাম আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনার চেষ্টা। উনিশ শতকের শেষার্ধ যদি জাতীয়তাবোধের দ্বারা স্পন্দিত, বিশ শতকের সূত্রপাত আন্তর্জাতিকতার অভিমুখে যাত্রারই ইঙ্গিত – যা পরবর্তী কালে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। আজ বিশ্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। আজ কোনও দেশ বা রাষ্ট্র এককভাবে টিকে থাকতে পারে না।

বিশ্বের সর্বকালের কবি-মনীষীরা বহুদিন পূর্বেই এই সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের অনুভূতির চেতনায়। করেছিলেন বলেই সকল দেশেই এক একজন কবি সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যিনি সর্বকালের সর্বমানবের প্রতিনিধি – যিনি আমার আপনার এদেশ – ও দেশ সকলের । শেক্সপীয়ার, টলস্টয়, গ্যেটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই শ্রেণির মনীষী। দ্বিজেন্দ্রলাল এদিক দিয়ে বিচার করলে সে যুগের ভারতের মর্মবাণীর রূপ দিয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন সেই সত্যকে। দ্বিজেন্দ্রলাল দুই যুগ - সন্ধিকালের কবি। তাই তাঁর রচনার শুরু জাতীয়তাবোধে এবং উত্তরণ বিশ্ববোধের অমৃতলোকে।

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' এর সময়ে যখন জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ পেল, জাতীয়-জীবনের তৎকালীন প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে মনীষীরা সেই ঐক্যবোধের প্রেরণাকে দেশপ্রেমের খাতে প্রবাহিত করে জাতীয় চেতনায় তুললেন আলোড়ন। সাধারণ মানুষ এই সত্যকে তার যর্থাথ স্বরূপে উপলব্ধি না করলেও তারা অনুপ্রাণিত হল।

কিন্তু মনীষীরা উপলব্ধি করলেন, নিছক জাতীয়তাবোধের মধ্যে একটা সংকীর্ণতা রয়েছে। সত্যকার জাতীয়তাবাদী যিনি – তাঁর স্বদেশপ্রেম যতই অকৃত্রিম হোক্, নিজের দেশের জিনিস ছাড়া আর সব কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা অন্য দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চান না, বরং অগ্রাহ্য করতে চান। এই যে গোঁড়ামি এটা চরম রক্ষণশীলতা। এইসব দেশপ্রেমিককে নিন্দা না করলেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করা কি যায়? যে ব্যক্তি 'বাঙালী' 'বাঙালী' করে মাতামাতি করেন, বাঙালীর মহিমায় যিনি তন্ময় হয়ে থাকেন – যিনি অন্য প্রদেশবাসীকে তুচ্ছ করে বাঙালিত্বের মহিমাকে সপ্রমাণ করতে চান – তিনি কতখানি সমর্থনযোগ্য? যিনি 'হিন্দু' বলে গর্ববোধ করেন বা 'খ্রীষ্টান' বলে গর্ববোধ করতে গিয়ে অন্য ধর্মকে তুচ্ছ করেন – তাঁর এই প্রেমবোধ কি উদারনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? এর ফলে অন্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জীবনযাত্রা, অন্য দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা তাঁর কাছে কোন গুরুত্ব পায় না। এই সংকীর্ণতার মধ্যে সত্যকার মনীষী কখনই আত্মিক যোগ অনুভব করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু কি 'হিন্দুধর্মে'র কথা বলতে গিয়ে ধর্মকে তুচ্ছ করেছেন?

কিন্তু স্বাধীনতালাভের উদগ্র কামনায় এইসব মনীষীরা তাই স্বদেশপ্রেমের মহিমাকীর্তন করেছেন। পরাধীন জাতির মর্মবেদনা ও শৃঙ্খলামুক্তির গান শুনিয়ে জাতিকে উবুদ্ধ করার যে মন্ত্র – সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা তাঁকে অস্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যের মধ্যেই এই সত্য বিধৃত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এইসব মনীষীরা এখানেই থামেননি। তাঁরা বুঝেছেন, শুধু স্বদেশের কল্যাণ নয়, জগতের কল্যাণই সত্যকার স্থায়ী মঙ্গল আনতে পারে। তাঁদের সাধনা তাই

সমস্ত জগতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা। সেজন্য দেখি, একদিকে তাঁরা দেশের বন্ধনমুক্তির সাধনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মার মুক্তির সাধনাতেও নিজেদের মনীষাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁরা কোনদিন বলেন নি যে, বিদেশীদের তুচ্ছ মনে কর, বলেন নি দেশের স্বার্থটুকু বযায় থাকলেই মঙ্গল হবে, বরং তাঁরা বারবার বলেছেন, স্বদেশের পাশাপাশি বিদেশের কল্যাণ, তাঁদের সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। প্রত্যেকের কাছ থেকেই শেখবার আছে, বিশ্বমৈত্রীর ঐক্যের বাণী তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁরা জাতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক। শুধু স্বদেশের নয়, বিশ্বমানবের বেদনায় তাঁরা কাতর। সেজন্য তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে শুধু স্বদেশবাসী নন, বিশ্ববাসী নিজেদের মর্মকথা শুনতে পেয়েছেন। তাই তাঁরা শুধু দেশের নন, তাঁরা বিশ্বমানবের প্রতিনিধি।

যে জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল, তারই পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটকে। পরাধীনতার গ্লানি-মুক্তির অমৃতাস্বাদ লাভের অত্যুগ্র কামনা জাগতিক লাভের পথে তাঁদের অঅনুপ্রাণিত করেছে। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের, স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটাকেই পরম লক্ষ্য বলে মেনে নেননি। ভারতের এই চিরন্তন আত্মোপলব্ধির সাধনা, অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ সেই স্তরে উন্নীত হলে দেশ - কালকে সহজেই অতিক্রম করা যায়য়। তাই সর্ব মানবকল্যাণবোধই তাঁদের সাধনার লক্ষ্য, তার সার্থকতাতেই তাঁদের সিদ্ধি। 'ভারত-আত্মার' অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বিশ্বমৈত্রীর অমৃতলোকে উত্তরণ করেছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের মানসে দুই ধারার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় – দেশাত্ববোধ বনাম বিশ্ববোধ, অবশেষে বিশ্ববোধ উত্তরণ। যে কবি গাইলেন – 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' সেই কবিকেই গাইতে শুনি – 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।'

জাগতিক লাভের জন্য মনে সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়; তাই 'দেশ' অর্থে শুধু 'নিজের জন্মভূমি'-কে বোঝানো হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। আসলে, এই সমস্ত মনিষীরা অধ্যাত্ম-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ভারত-

আত্মার মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন বলেই ঐহিক প্রাপ্তিকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নেননি। যাতে অমৃতের স্বাদ না পাব, তাতে তো সত্যকার তৃপ্তি নেই। তাই তাঁদের কাছে দেশের ভৌগোলিক সীমা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। তখন বিশ্বই আমার দেশ – বিশ্বের মধ্যেই দেশকে দেখেছেন তাঁরা, সিন্ধুর বিরাটত্বের মধ্যেই বিন্দুর অতলান্তিক গভীরতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা। ঘরের দেওয়াল তাঁদের কাছে আবদ্ধতার কারাগার হয়ে থাকে নি, – বিশ্বের মানুষ তাঁদের আপনজন, আত্মার আত্মীয় – 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। তখন তাদের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের প্রতি প্রেমবোধই সত্য। প্রেম মানেই তো অমৃত – অধ্যাত্মবোধ। দ্বিজেন্দ্র-মানসের এই প্রকাশধারা, তাঁর পরিণত মানসের ফসল – এবং তাই তাঁর নাটকের মধ্যে প্রকাশিত। সেজন্যই বলছি, যুগের পটভূমিকায় ও প্রভাবে দ্বিজেন্দ্র-মানস গড়ে উঠেছে।

১.৩ নাট্যকার পরিচিতি

একজন শিল্পীর যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে, যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনের নান বহিরঙ্গিক ঘটনাপঞ্জিতে, তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন ধরা পড়ে মনোজীবনের বিশ্লেষণে। তাই শিল্পীর সাহিত্য - সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর ব্যক্তিজীবন তথা সেই যুগ ও সমাজকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, কারণ সেই বিচারের নিরিখেই ধরা দেবে শিল্পীর কবিমানস। যেমন, রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের বিশ্লেষণ তখনই পরিপূর্ণভাবে আমাদের কাছে ধরা দেবে, যখন আমরা ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণ তথা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বরূপকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের সত্য-স্বরূপকে জানতে হলে, আগে জানা দরকার তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাধনার কোন্ পথে একাধারে যুগ ও যুগাতীতের শিল্পী হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করেছেন, সেটাও বিশ্লেষণ করা দরকার।

আপাতদৃষ্টিতে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা জানা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা শুধু শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের গতিকে পরিবর্তিত করে দেয় নয়, শিল্পীর ভাবজীবনকেও নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করে

দেয়। যেমন – দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী - বিয়োগের ঘটনা তাঁর মনোজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই সত্যটুকুকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর জীবন-কাহিনি মোটামুটি জেনে রাখা প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কার্তিকচন্দ্র বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই সহৃদয় উদারচেতা মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তিনিও সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি সবিশেষ ভাবে নজরকাড়া ছিল। স্বরচিত গীতিসংগীত ছাড়া তাঁর রচিত আত্মজীবনী ছিল উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার চরিত্রের এই সব প্রবণতা ও গুণাবলী পেয়েছিলেন। তাঁর তেজস্বীতা, কৌতুকপ্রিয়তা, পান্ডিত্য, শিল্পানুরাগীতা দ্বিজেন্দ্রলালকে যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানরূপে প্রতিপন্ন করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন-

'...যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চির আরাধ্য পিতৃদেব...'

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে তাঁর মাতা প্রসন্নময়ী দেবীর প্রভাবও লক্ষণীয়। প্রসন্নময়ী দেবী প্রখ্যাত পন্ডিতবংশের কন্যা ছিলেন। এই আদর্শ জনক-জননীর প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে বিচিত্র গুণাবলীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

ছোটবেলা থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি ১৮৮৩ সালে হুগলী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাহিত্যে এম এ পাশ করেন প্রেসিডেন্সি থেকে।

তাঁর সাহিত্যসাধনা ছাত্রাবস্থাতেই, প্রথম কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা প্রথম ভাগ (১৮৮২) বেরোয়। ১৮৮৪ সালে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। বিলেত প্রবাসকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য জগতের বিচিত্র অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে জানেন ও অনুধাবন করেন। দাম্পত্যজীবন তাঁর সাহিত্যসাধনায় অনেকখানি প্রভাব ফেলে, এই সময় একের পর এক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রহসন, হাসির গান,

কাব্যনাট্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি সৃষ্টির আনন্দে কবি তখন মগ্ন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই শান্তিপূর্ণ জীবনে অকস্মাৎ বিপর্যয় দেখা দিল। যে সুরবালা দেবীকে কেন্দ্র করে কবি-জীবন পূর্ণোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেই সুরবালা দেবী একটি মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করে পরলোকগমন করলে, তিনিও প্রচণ্ড ভাবে ভেঙে পড়েন।

১৯০৫ সালে সমগ্র বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেখা দিলে, কবিচিত্তকেও তা ব্যপক ভাবে আলোড়িত করে। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ ও উগ্র প্রকাশ। দেশাত্মবোধক সংগীত ছাড়া ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যেও দেশপ্রেমের ও জাতীয়তাবোধের সুস্পষ্ট স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ পর্বে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। এই মতবিরোধ কিছুদিনের জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উভয়ের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর-গ্রহণ অল্পকাল আগে তিনি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদ্‌যোগী হন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের আগেই ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৯১৩ সালের ১৭ই মে) সন্ন্যাসরোগে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়।

১.৪ দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যজীবনের নানামাত্রিক পর্যায়ক্রম ও সাজাহানের আবির্ভাব

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসাধনা দীর্ঘকালব্যাপী না হলেও বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনাবলী মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১ম - গদ্যরচনা, ২য় – কাব্যকবিতা ও গানরচনা, ৩য় - নাটক রচনা। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব থাকলেও চর্চার অভাবে এই শ্রেণির রচনা তেমন সার্থকতা লাভ করেনি। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার আলো তাঁর কবিশক্তির যথাযথ রূপায়নকে তুলে ধরে নি একথা বলাই যায়, স্বীকৃতির পথে অনেকখানি অন্তরায় বললেই হয়, সেই যায়গা থেকে নাট্যচর্চা তাঁর ক্রমবিকশিত চিন্তাজগতকে ভিতর থেকে নাড়া দিয়েছিল। আমাদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর হাসির গান আর নাটকের জন্য।

মন্তব্য

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা(১ম ভাগ) কবিতা ও গানের সংকলন। তাঁর কবিতা রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন – শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। আর্যগাথা ১ম ভাগে ১৮৮২ সাল থেকে প্রকাশিত নক্ষত্র বিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি। ১২ বছর থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে আর্যগাথা নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতা লিখিতাম। কিন্তু কোনও কবিতা প্রকাশিত হয় নি। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক একটি কবিতা নব্য ভারতে প্রকাশিত হয়।

আর্যগাথা প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলালের যর্থাথ পরিচয় এই দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। এই প্রতিভার বিকাশ তাঁর বাল্যকাল থেকেই। আর্যগাথার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন – 'যাঁহারা একমাত্র মনুষয়-প্রেম-গীতিকেই গীত মনে করেন, আর্যগাথা তাহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখনও কখনও প্রকৃতি রচয়িতার অনন্ত মহিমায় শুদ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরাসংকুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া থাকেন, অশ্রুবারি বর্ষণ করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখনও সিক্ত হইয়া থাকে, আর্যগাথা তাঁহারই আদর চাহে।'

আর্যগাথা গ্রন্থের কবিতাগুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। ১) প্রকৃতি পূজা ২) ঈশ্বর স্তুতি ৩) বিষাদোচ্ছ্বাস ৪) দেশপ্রেমমূলক। অবশ্য আর্যগাথার দ্বিতীয় ভাগ ভিন্ন প্রকৃতির। কবি জীবনের উপলব্ধ সত্য কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্র গবেষক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন –

"দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোকে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল, তাই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে, সৌন্দর্য ও প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। আর্যগাথা (২য় ভাগ) কাব্যের মূল উৎস নারীপ্রেম। ...কবির স্বপ্নবিহ্বল মনের এমন সুরধর্মী ও আত্মতন্ময় প্রকাশ তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যেও দুর্লভ। বিশ্বপ্রকৃতিও প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।" এমন কি আর্যগাথার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বিলেত প্রবাসকালে রচিত কবির আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য 'lyrics of Ind'. কবি বলেছেন – 'বিলাতে গিয়ে ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্র করিয়া স্যার এডুইন আর্ণল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাই।'

এরপর দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক দুখানি গ্রন্থ 'আষাঢ়ে'(১৮৯৯) এবং হাসির গান(১৯০০) প্রকাশিত হয়। এইও দুখানি গ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'তিনি যে সকল বাঙালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।'

'হাসির গান' আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন – '...নির্মম ব্যঙ্গ - বিদ্রুপই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মুল সুর নয়, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে একটি সহানুভূতিপ্রবণ আবেগময় কবিচিত্ত ছিল। ...তাঁর হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সশব্দ। জীবনের সত্য নিষ্ঠুরতম করুণতম সত্য তাঁর হাসির গানের মধ্যে যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন তারই আলোকে আমাদের মুখচ্ছবি বিবর্ণতা ধরা পড়ে, তখন হাসতে গিয়ে নিজের হাসির শব্দে অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। ...দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের বহু উপকরণই স্থূল, কিন্তু সেই দৈনন্দিন জীবনের স্থূল উপকরণগুলিকেই তিনি উন্নত শিল্পমর্যাদা দিয়েছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ...'

'আষাঢ়ে', 'হাসির গানে'র পরবর্তী কালে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থ, ১৯০৭ সালে 'আলেখ্য', ১৯১২ সালে 'ত্রিবেণী' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-গবেষক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন – 'মন্দ্র কাব্যে কবি যে শক্তি অর্জন করেছে, দ্বিজেন্দ্রের কবি-জীবনই হলো চূড়ান্ত সিদ্ধি। ...এই কাব্যে কোথাও ভাবালুতার অস্পষ্টতা নেই, প্রকাশরীতির দ্বিধা নেই – এক জড়তামুক্ত ও ভাবাবেগমুক্ত বুদ্ধিগম্য স্পষ্টালোকিত জগৎ 'মন্দ্র' কাব্যের কাব্য-পটভূমি। .. মন্দ্র কাব্যের কাব্যরীতি ও কলাবিধিতে সর্বপ্রথম একটি ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক স্টাইল দেখা দিয়েছে। 'মন্দ্র' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রজীবনের শুধু নয়, দ্বিজেন্দ্র-কবি-জীবনেরও শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের সমাপ্তি চিহ্ন।'

'আলেখ্য', ও 'ত্রিবেণী' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ বলেন – 'এই দুটি কাব্যকে দ্বিজেন্দ্র – কাব্য - প্রবাহের পরিণতি পর্বের কাব্য বলা যায়। ... 'আলেখ্য' কাব্যের সুরে একটি বিষাদময় অনুভূতি জড়িত আছে।' এর জন্য কবির পত্নীবিয়োগের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অনেকখানি দায়ী। ... 'ত্রিবেণী' কাব্যে লঘুচিত্ত পরিহাস ও শ্লেষ বিদ্রুপের ভ্রুভঙ্গি নেই বললেই চলে। কাব্যটির সুর প্রশান্ত গভীরেই নয়, গম্ভীরও বটে। ... 'ত্রিবেণী' কাব্যে কবি প্রিয়া আর গৃহ পরিজন পুত্র কন্যার সংসার সীমায় আবদ্ধ নন- তিনি স্মৃতির তীর্থে নৈব্যক্তিক ভাব রহস্যে অধিষ্ঠিত। ...'

এইবার আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাঁর নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করব। নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ ধারাকে যথেষ্ঠ পুষ্টিদান করে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন – সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, গীতিমূলক রচনা, প্রহসন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা চলে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সাহিত্যের ধারাকে অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারা খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' প্রবন্ধে বলেছেন – 'বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। ...বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি হেমলতা নাটক ও নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison এর Cato এবং Shakespeare –এর Julius Caesar –এর আংশিক হয়। ... ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে। বিলাত হইতে ফিরিয়া বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলি সহিত আমার পরিচয় হয়।'

"প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার' নামে একখানি প্রহসন গদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি

হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি। ... তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি... 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি। ... সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। মৎপ্রণীত 'সীতা' নাট্যকাব্য... পরে 'পাষাণী' নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি 'তারাবাঈ' নাটক প্রকাশ করি। যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নাট্য সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত।' আমার কাব্যশক্তি (জাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare এর অনুকরণে Blank Verse এ নাটক আরম্ভ করি। ... 'তারাবাঈ' প্রকাশিত হইবার পরে ... নবীনচন্দ্র সেন ... এই মত প্রকাশ করেন যে, এ নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর – মাইকেলের ছন্দোমাধূরী ইহাতে নাই – এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে – অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা তো গদ্যের মত হইতেই হইবে।

পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই। বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে তো পদ্য... তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিস। অভিনেয় ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্যই উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেই জন্যই আমি আমার 'তারাবাঈ'- এর পরবর্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে

প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি। যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম, তখন একখানি অপেরা (সোরাবরুস্তম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। ...মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর নাট্যজীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রহসন, গীতিনাট্য ইত্যাদি মিলিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কুড়িটি নাটক রচনা করেন। জনৈক সমালোচক যর্থাথই বলেছেন – একদিকে দুর্নীতিমধুর লঘুলাস্যের স্রোত এবং অপরদিকে জীবনাবেগবর্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তি-বিহ্বলতা ও পাপপুণ্য সংস্কারের তামসিক আদর্শ সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্য-শিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জিত করিয়া এবং নাটক রচনায় কাব্যসংগত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন – জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার কথা আমরা জানি।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সামাজিক প্রহসন 'কল্কি অবতার' বা 'সমাজ বিভ্রাট' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য 'এক ঘরে' নক্সাটি তিনি এর পূর্বেই রচনা করেছিলেন। 'কল্কি অবতার' কে কেউ কেউ প্রহসন না বলে কতকগুলি কৌতুক চিত্রের সমষ্ঠি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখানে দেবদেবীদের নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে। এর আগে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কোনও গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমসাময়িক কালে নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই সময়ে আর একটি প্রহসন তিনি রচনা করেন – 'ত্র্যহস্পর্শ' নামে।

পরবর্তী প্রহসন 'বিরহ' – এর উৎসর্গ পত্রে তিনি হাস্যরস ও প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বলেছেন – 'সব বিষয়ের দুটি দিক আছে। একটি গম্ভীর ও অপরটি লঘু। 'বিরহ'-এরও তাহা আছে। হাস্যরস দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক - সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া।' 'বিরহ'-এর কৌতুকবোধ তাই যথেষ্ঠ উপভোগ্য। এই প্রহসনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ এর গান।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী' গীতিনাট্য রচনা করেন। প্রহসন বাদে এই 'পাষাণী' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাটিকা। পুরাণের কাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে। অবশ্য রামায়ণের কাহিনি সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয়নি। এই নাটিকাটিতে বহুলাংশে মনস্তত্ত্ব উঠে এসেছে প্রবল ভাবে। পাষাণী'র পরে তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে আর একটি প্রহসন রচনা করেন। এটি 'বহুত আচ্ছা' নামে অভিনীত হয়। নাট্যকার বলেছেন – "বিলাত ফেরতা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে – প্রায়শ্চিত্ত প্রহসনে সেই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত প্রহসনগুলির মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।"

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম তাঁর ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'তারাবাঈ' রচনা করেন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। টড্ –এর 'এনালাস্ এন্ড আন্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে তিনি এই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেন। নাটক হিসেবে 'তারাবাঈ' সার্থক নয়। এরপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় 'রাণা প্রতাপসিংহ'। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন – 'স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় বাঙালী চিত্তের যে অভিনব জাগরণ হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে তিনি যুগজীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন করে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই আমরা বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের পরিচয় পেয়েছি। যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন তার ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'রাণা প্রতাপসিংহ' মোটামুটি স্মরণযোগ্য। যদিও নাটকীয় আঙ্গিকের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

১৯০৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরায় টড্-এর গ্রন্থ অবলম্বনে 'দুর্গাদাস' নাটক রচনা করেন। কিন্তু টড্ –এর গ্রন্থের যথাযথ ঐতিহাসিক আনুগত্য তিনি রক্ষা করতে পারেননি। ঘটনার আতিশয্য ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলীর ভিড়ে নাটকীয় ঐক্য বার বার

বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবোধের বাণী তিনি এই নাটকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক... সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই।' এইসব সংলাপগুলি নাটকের রসকে অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন করেছে। জাতীয়তাবোধের আবেগ এখানে স্পন্দিত। তথাপি চিরন্তন সাহিত্যবিচারের মাপকাঠিতে এগুলিতে অনেকক্ষেত্রে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। যদিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় এই নাটকগুলি 'পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্মগ্রন্থ পড়িতেছি। মনে হয় যেন স্বদেশভক্তির উজ্জ্বল কাহিনি পড়িতেছি... দ্বিজেন্দ্রলাল এই পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় 'নূরজাহান' নাটক। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নায়িকা চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন – 'এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষোগুণ সমন্বিত মনুষয়-চরিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি। তৃতীয় প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি।' এই নাটকটির পরিকল্পনায় তিনি শেক্সপীরীয় নাট্য-আঙ্গিকের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অন্যান্য রচনার মধ্যে স্মরণীয় 'সোরাব-রুস্তম' নাট্যরঙ্গ বা অপেরা, 'সীতা' নাট্যকাব্য এবং 'মেবার পতন' নাটক। ফার্দৌসির 'শাহনামা' অবলম্বনে তিনি 'সোরাব - রুস্তম' রচনা করেন। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন – "আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল হাবভাব সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্য রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন এবং সুরুচিসম্মত নাটক বা নাটিকার আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে সুরুচিসম্মত অপেরা এখন চলে কি না।"

'সীতা' নাট্যকাব্যে তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে পৌরাণিক কাহিনিকে নবরূপ দান করেছেন। তাঁর সীতা-চরিত্র একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' গ্রন্থ দুটি থেকে। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম-চরিত্রে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকাব্য হিসেবে 'সীতা' দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সম্যক পরিচয় বহন করে।

'মেবার পতন' টড্ –এর গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। এই গ্রন্থে মেবারের রাণা অমরসিংহের বিস্তৃত কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। ভূমিকায় জানিয়েছেন – 'এই নাটকে আমি একটি মহানীতির আলোচনা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছি'। মেবার পতন নাটকের পর সাজাহান নাটকটি ১৯০৯ সালে রচিত হয়। মোগল যুগকে কেন্দ্র করে তিনি যে কয়খানিও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে আঙ্গিকের বিচারে, চরিত্র-সৃষ্টিতে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। এখানে তিনি ইতিহাসকে যথাযথরূপে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার এখানে দার্শনিকের দৃষ্টিতে জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন; মানব জীবনের সত্য ও ইতিহাসের তথ্যের সমন্বয় ঘটেছে 'সাজাহান' নাটকে। 'সাজাহান' –এ কেন্দ্রীয় চরিত্র কে তা নিয়ে মতোবিরোধ হলেও আঙ্গিক নৈপুণ্যে, চরিত্র-বিশ্লেষণে, সংলাপ রচনায়, গীত পরিবেশনে এই নাটকটি দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর। জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও এই নাটকটি তুলনা রহিত।

এরপর ১৯১১ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। হিন্দু যুগকে অবলম্বন করে রচিত হয় চন্দ্রগুপ্ত। এই নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাচুর্য না থাকায় নাটকটি বহুলাংশে কল্পনা-ভিত্তিক হয়ে পড়েছে। নাট্যকার বলেছেন, পুরাণ ও গ্রীসীয় ইতিহাস অবলম্বনে তিনি এই নাটক রচনা করেন। এই নাটকেও কেন্দ্রীয় চরিত্র নিয়ে যথেষ্ঠ মতবিরোধ আছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের সৃষ্টিতে অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চাণক্য-চরিত্রে তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে চাণক্য-চরিত্র একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। জনৈক সমালোচকের মতে – "বিদ্বান, বিচক্ষণ ও কুশাগ্র-বুদ্ধি এই ব্রাম্ভণ ভাগ্য – বিড়ম্বিত ও নিপীড়িত ... ভাগ্যবিড়ম্বিত

চাণক্য সৌন্দর্য, করুণা ও বিশ্বাসের স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর চরিত্রে ক্ষমা, সমকামনা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তিরোহিত হয়েছে। তাই স্থান অধিকার করেছে জ্বলন্ত প্রতিহিংসা - স্পৃহা ও নির্মম অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী চাণক্য বীভৎসতার প্রেমিক হয়ে উঠলেন। শ্মশানে হল তাঁর নিত্য বিচরণ ক্ষেত্র।" চরিত্র-সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিলেও 'চন্দ্রগুপ্তে'র আঙ্গিকে শৈথিল্য নজরে পড়ে। তথাপি, 'সাজাহান'-এর মতই 'চন্দ্রগুপ্ত' আজও জনপ্রিয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল আর একখানি প্রহসন রচনা করেন – 'পুর্নজন্ম' নামে। কৌতুকরস, সুরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের গুণে প্রহসনটির অত্যন্ত উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ প্রহসন 'আনন্দবিদায়' রচিত হয় ১৯১১ সালে। সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে এই প্রহসন অসার্থক এবং অন্যান্য প্রহসনগুলির তুলনায় ব্যর্থ। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'পরপারে' রচিত হয় ১৯১২ সালে। তাঁর দ্বিতীয় সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী' তিনি সম্পূর্ণ সংশোধন করে যেতে পারেননি। 'বঙ্গনারী' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯১৬ সালে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে 'সিংহল বিজয়' নামে।

তাঁর সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। মহাভারতকে অবলম্বন করে তিনি এই নাটক রচনা করলেও মহাভারতের কাহিনির প্রতি নাট্যকার সর্বত্র আনুগত্য রক্ষা করতে পারেননি। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও শৈথিল্য এই নাটকে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্র – প্রতিভার নৈপুণ্য এখানে অনেকাংশে ম্লান। ভীষ্ম চরিত্র-পরিকল্পনায় নাটকের সামগ্রিক রূপায়ণ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।

১.৫ সাজাহান নাটকের প্রেক্ষাপট

সাজাহান নাটকের ঘটনাবলী তাঁর শেষ আট বছরের কাহিনি। অসুস্থ বৃদ্ধ সাজাহান সম্পর্কে জনরব ছড়িয়ে পড়ে যে, সাজাহান মৃত। তাঁর নিত্যসঙ্গী পুত্র দারা সাজাহানের নামে রাজ্য শাসন করছেন। ফলে বঙ্গদেশে সুজা, গুজরাটে মোরাদ, দাক্ষিনাত্যে ঔরংজীব স্ব স্ব প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতৃত্বের এই জটিল

দ্বন্দ্ব নাটকের শুরু। সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের শাসন করতে দারাকে নির্দেশ দিলেন, দারারই বিশেষ অনুরোধে। একদিকে পিতা সাজাহান, পুত্রদের দ্বন্দ্বে কাতর, অন্যদিকে সম্রাটের মর্যাদা রক্ষায় সচেতন। জাহানারাকে তিনি নিষেধ করছেন এই ভ্রাতৃবিরোধে জড়িয়ে না পড়বার জন্য। অন্যদিকে জাহানারা বৃদ্ধ পিতাকে বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি অকারণ দৌর্বল্য প্রকাশ করতে নিষেধ করছেন। এইভাবে নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলেছে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔরংজীবের কূটকৌশলে ও রাজনৈতিক চক্রান্তে দারা সপরিবারে বন্দী হয়ে জিহন খাঁর দ্বারা নিহত হন। মদ্যপ মোরাদ বন্দী হয়ে নিহত হন। সুজা সপরিবারে আরাকানের দিকে বিতাড়িত হয়ে শেষে মৃত্যুবরণ করেন। ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদের নিয়ন্ত্রণে আগ্রার দুর্গে সাজাহান বন্দী জীবনযাপন করেন। কন্যা জাহানারা বন্দী পিতার পরিচর্যার ভার নেন। অবশেষে পিতা সাজাহান সম্রাট সাজাহানের সত্তাকে পরাজিত করেন। ঔরংজীব নাটকের শেষে সাজাহানের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং সাজাহান তা অনুমোদন করেন। এই কাহিনির মধ্যে আমরা সাজাহানের চারপুত্রকে যেমন পাই, তেমনি পাই দারার দুই পুত্র, ঔরংজীবের পুত্র, জয়পুর পতি জয়সিংহ, যোধপুররাজ যশোবন্ত সিংহ ও ছদ্মবেশী জ্ঞানী দিলদারকে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দিলদার ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রগুলি নিজেদের ভূমিকানুযায়ী নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন। মোটামুটি কল্পিত চরিত্র দিলদারও ইতিহাসের ঘূণাবর্তে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন। জাহানারা ছাড়া স্ত্রী চরিত্র হিসেবে আমরা দারার স্ত্রী নাদিরা ও কন্যা জহরৎউন্নিসাকে এবং সুজার স্ত্রী পিয়ারা ও যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী মহামায়াকে। এদের মধ্যে পিয়ারা ও মহামায়া ইতিহাসসঞ্জাত চরিত্র। অর্থাৎ এদের চরিত্র ইতিহাসে থাকলে এমনটিই হতো। এই বিচিত্র চরিত্র সম্ভারে, ঘটনার নান উত্থান ও পতনে, স্নেহ-প্রেম-বিরহ-মিলনের কাহিনির পাশাপাশি মোঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঘূণাবর্ত মানবিক অনুভূতির সঙ্গে মিশে সাজাহান নাটককে একটি পরিপূর্ণ রূপ দান করেছে।

১.৬ কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নামকরণ

কোনো ও কাহিনীতে নামকরণ সমগ্র কাহিনির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নামকরণ নানা ধরনের হতে পারে। কখনও কখনও কাহিনির অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে শিল্পী নামকরণের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কখনও কখনও বা কাহিনির পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নামকরণ করা হয়। কখনও আবার কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্বারা কাহিনীর নামকরণ করা হয়। উপন্যাস নাটক সমস্ত ক্ষেত্রেই এই রীতি প্রযোজ্য।

'সাজাহান' নাটক নিয়ে মোটামুটি একাধিক মত শোনা যায়। একদল সমালোচক বলেন, 'সাজাহান' নাটকের নামকরণ যর্থাথ এবং নাট্যকারের মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। অন্য এক শ্রেণির সমালোচক বলেন, 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঔরংজীব। সুতরাং ঔরংজীব নামীই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিৎ। কোনো পন্ডিতের মতে জাহানারা এই নাটকের প্রধান চরিত্র, তাঁর নামেই এই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিৎ। আমাদের এখন প্রত্যেকটি মত বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিৎ যে, কোন নামকরণটি উপযুক্ত।

প্রথম প্রশ্ন উঠবে – প্রধান চরিত্র বা কেন্দ্রিয় চরিত্র কাকে বলে। আমরা জানি, কতকগুলি দৃশ্যের অসংলগ্ন উপস্থাপনা নাটক সৃষ্টি করতে পারে না। দৃশ্যগুলি পর পর চিত্রিত করে তার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বিশেষ একটি বক্তব্যকে বা উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং অ্যারিস্টটলের সূত্রানুসারে বিষয়বস্তুর ঐক্য না থাকলেও আধুনিককালে বিচিত্র চরিত্র ও দৃশ্যাদির সমাবেশ নাট্যকার বিশেষ একটি বক্তব্যকেই ফুটিয়ে তোলেন। নাট্যকার এই বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলেন দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। এই দুই বিপরীত শক্তির একদিকে থাকে নাট্যকারের বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যম বিশেষ চরিত্রটি ও তাঁকে পরিপুষ্ট করতে অন্য ঘটনাবলী ও চরিত্রবলী। অন্য দিকে থাকে সেই চরিত্রকে বিরোধিতার দ্বারা নাট্যকারের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার সহায়তা করে যে চরিত্র। নাট্যকারের বক্তব্য যে চরিত্রটির মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে, তাকেই আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে থাকি। কিন্তু যদি কোনো চরিত্র তার সক্রিয়তার

দ্বারা ও বুদ্ধি-কৌশলে নাটকে প্রাধান্য বিস্তার করে, সে চরিত্র নাটকে প্রধান হলেও নাটকের প্রকৃতি বিচারে তা কখনোই মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ নায়ক হতে পারে না। যেমন, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্তের তুলনায় চাণক্য অনেক বেশি সক্রিয় ও প্রধান; তৎসত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্ত এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কারণ তাঁকে অবলম্বণ করেই নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশিত এবং চাণক্য সেই বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক চরিত্র অর্থাৎ প্রতি-নায়ক। আমাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়কের নামে নামকরণ করা হয় বা হয়ে থাকে।

'সাজাহান' নাটকে নাট্যকার সাজাহানের জীবনের শেষ আট বছরের বেদনাদায়ক কাহিনী চিত্রিত করেছেন। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে কলঙ্কিত এই ক'বছরের ইতিহাস। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, মোরাদ এবং ঔরংজীব স্বার্থের হানাহানি তে মগ্ন। কিন্তু সাজাহানের কাছে অনুগত পুত্র দারাও যেমন স্নেহাস্পদ, বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবও তেমনি। তাই দারাকে বিদ্রোহী-দমনের জন্য পাঠিয়ে সম্রাট সাজাহান তার দায়িত্ব পালন করেছেন বটে, কিন্তু পিতা সাজাহানের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। জাহানারাকে তিনি বলেছেন – "তুই এই বিরোধের মধ্যে জড়াস্‌নি। তুই অন্ততঃ এই বিরোধ থেকে দূরে থাক।" সুতরাং আমরা দেখি 'সাজাহান' নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পিতা ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সাজাহানের সম্রাটত্ব পিতৃত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে, শাশ্বত পিতৃত্বের মহিমা বিঘোষিত হয়েছে। নাট্যকার সেই তথ্যই বা বক্তব্যই এখানে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সাজাহান বাইরের আচরণের দিক দিয়ে ঔরংজীবের মত অতখানি ক্রিয়াশীল না হলেও নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে সমগ্র নাটকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব পেয়েছেন এবং এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করছেন সাজাহান। সেইজন্যই তিনিই এই নাটকের কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্র। তাই তার নামকরণে নাটকের নামকরণ সার্থক। সাজাহান নাটকের দৃশ্য-সংযোজনা এবং আঙ্গিকগত কৌশল আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। ট্র্যাজেডি আলোচনায় আমরা বলেছি, নবকৃষ্ণ ঘোষের মতানুসারে দারা চরিত্র-কেন্দ্রিক নামকরণ করা যর্থাথ হতো

না। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "নাটকটির নাম জাহানারা হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত।" এ মত যে সংগত নয় আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

যে সব সমালোচক ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে চান, তাঁদের মতে "ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র এবং 'ঔরংজীবই' কাহিনির মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়াছেন।" 'সাজাহান' নাটকটিকে যদি আমরা ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে ঔরংজীবের ট্র্যাজেডি দেখানোই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গেলে যে যে লক্ষণ চরিত্রের মধ্যে থাকা উচিৎ, ঔরংজীব চরিত্রে তা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে – সে বিষয়ে নিঃসন্ধেহ হওয়া দরকার। ঔরংজীবের কূটবুদ্ধির বারবার জয়লাভ এবং শেষ পর্যন্ত সাজাহানের কাছে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা দর্শকচিত্তে তাঁর প্রতি কোনোরকম সহানুভূতি জাগ্রত করে না? ট্র্যাজেডির নায়কের যে বিভিন্ন সদ্‌গুণ থাকে, তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ দুর্বলতার ছিদ্রপথ ধরে তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করা, নিজের সিংহাসনকে নিষ্কন্টক করবার জন্য একে একে ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্ত কূটকৌশলী ঔরংজীবের প্রতি পাঠকের কোনো সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। নিজের পুত্রকে যিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না। সেই উচ্চাভিলাষী ঔরংজীবকে শাইলকের মত ভিলেন বলা যেতে পারে, কিন্তু ম্যাকবেথের মত নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই সমগ্র নাটকে ঔরংজীবের ক্রিয়াকলাপ একদিকে যেমন দর্শকের মধ্যে Pity জাগাতে পারেনি, অন্যদিকে ঔরংজীবের এমন কিছু বিপর্যয় ঘটেনি যা দর্শকচিত্তে ভীতি ও করুণা জাগ্রত করে।

সুতরাং বলা চলে ঔরংজীব বাইরের দিক দিয়ে যতই নাটকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকুন না কেন, নাট্যকার যে বক্তব্য নাটকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন, তা সাজাহানকেন্দ্রিক। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্বময় সত্তার প্রকাশ, পুত্রদের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য সাজাহানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এই সমস্ত কিছুই ছিল তাঁর একান্ত ভ্রান্তির কারণ। দারাকে অন্যান্য পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়ে সম্রাট সাজাহান তাঁর কর্তব্য পালন করেছে, কিন্তু পিতা সাজাহান এই

ভ্রাতৃত্বের ইন্ধন জুগিয়ে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। এই স্নেহাতিশয্যের জন্যই সাজাহানের বন্দিদশা, পুত্রদের মৃত্যুজনিত শোকের আঘাত সমস্তই সাজাহানকে সহ্য করতে হয়েছে। তাই সাজাহান কাহিনিতে বারবার আত্মপ্রকাশ না করলেও নাটকের কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ সাজাহানকে অবলম্বন করেই নাটকের উত্থান পতন ও পরিণতি। ঔরংজীবের জয়লাভ বা বিবেকের দংশন অথবা মার্জনা-ভিক্ষা দেখানো এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল সাজাহানের দ্বন্দ্বময় পরিণতি দেখানো। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব দেখিয়েই নাটকের শুরু। তারপর নাটকের অগ্রগতিতে নিজের ভাগ্য বিপর্যয়, পুত্রের অকৃতজ্ঞতা, অন্য পুত্রদের মৃত্যু – এইভাবে একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত সাজাহানের শেষ দৃশ্যে সেই পুত্র-স্নেহেরই দ্বন্দ্বে নাটকের এই পরিণতি। বৃদ্ধ সাজাহানের শেষ আট বছরের এই করুণ ট্র্যাজেডিময় জীবন চিত্রিত করাই নাটকের মূল উদেশ্য। সেই দিক থেকে বিচার করলে সাজাহানকে আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সার্থক বলতে পারি এবং সেই বিচারে সাজাহান নাটকের নামকরণ সার্থক।

ট্র্যাজেডির রূপান্তরের প্রশ্নে অনেকেই বলতে পারেন পুত্র স্নেহ কি এতটাই দোষের? স্নেহ দোষের নয়, স্নেহের আতিশয্য দোষের, আর সেই দোষই সাজাহান নাটকের ট্র্যাজেডির মূল কারণ। কেননা ট্র্যাজেডির নায়ককে সবসময় বহিরঙ্গভাবে সক্রিয় থাকতে হবে তেমন কোনো কথা নেই। সাজাহানের সংগ্রাম বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা নিজের দুই সত্তার মধ্যে। তাই সাজাহানের চিন্তায় রাজ্য রক্ষার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এই ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ – "আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার!" তাই তাঁর সমস্যা 'যে পক্ষেরই পরাজয় হয় আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হলে আমায় তোমার ম্লান মুখ কল্পনা করতে হবে'। ঔরংজীব বা দারা, সুজা, মোরাদ সকলেই পরিণতির শেষ আঘাত এসে লেগেছে সাজাহানকে। সুতরাং সাজাহানই সেই হিসেবে নাটকের ট্র্যাজেডির প্রধান নায়ক, নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্যও তাই নামকরণের দিকে ইঙ্গিত করে।

১.৭ সাজাহান চরিত্র আলোচনা

দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান চরিত্রটি তাঁর সমগ্র নাট্যসাহিত্যের মধ্যে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বাংলা মঞ্চের জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও চরিত্রটি উল্লেখের দাবি রাখে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, সাজাহান চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাছাড়া ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত কোনো দুর্বলতা বা বিচার-বিভ্রম তাঁর দুঃখভোগের কারণ নয়। অর্থাৎ সাজাহান যে দুঃখভোগ করেছেন, তা নিষ্ক্রিয়ভাবেই করেছেন এবং তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য তিনি নিজে দায়ী নন। তাছাড়া নাটকে সাজাহানের জীবনের পরিণতি কোনোরূপ বিপর্যয়কর নয়, যাতে সাজাহানের চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক নায়কের মর্যাদা ও মহিমা দেওয়া যায়।

সাজাহান চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের এই আপত্তি আলোচনা করা দরকার। সাজাহান চরিত্রে দ্বন্দ্ব নেই, একথা সত্য নয়। একদিকে স্নেহাতুর পিতা পুত্রকন্যাদের জন্য উদ্বিগ্ন, অন্যদিকে সম্রাট সাজাহানের মর্যাদাবোধ ও রাজকীয় অভিমান – সাজাহান চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব, এক সত্তার সঙ্গে অন্য সত্তার বিরোধ নাটকের সূত্রপাত থেকেই আমরা লক্ষ্য করি। সাজাহান চান তিনি মাতৃহারা অবাধ্য পুত্রদের স্নেহের শাসনে বশ করবেন – "আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন" কিন্তু সম্রাট সাজাহানের সত্তা সাময়িকভাবে প্রধান্য বিস্তার করে সম্রাটের কর্তব্য পালন করবার জন্য, বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য দারাকে নির্দেশ দিয়েছে। এই সাময়িক বিভ্রান্তি ভ্রাতৃ-বিরোধকে তীব্রভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সাজাহানের এই 'Error of judgement' তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে ডেকে এনেছে, যার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। দারাকে আজ্ঞা দিয়ে পিতা সাজাহান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দারা পিতাকে বার বার আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, তাদের কাউকে কোনো রকম দৈহিক পীড়ন না করে বন্দী করে এনে সাজাহানের কাছে অর্পণ করবেন। পিতৃসত্তা এবং সম্রাটসত্তার মধ্যে আপস করতে গিয়ে সাজাহান নিজেই বিপর্যয় ডেকে এনেছেন, নিজেই নিজের ক্ষতি করেছেন। এই পিতৃসত্তায় আধিপত্য বিস্তার করেছে বলেই, বিজয়ী পুত্র ঔরংজীবকে তিনি বিনা বাধায় আগ্রা দুর্গে সৈন্য নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। পুত্রের

অকৃতজ্ঞতায় তিনি আঘাত পেয়েছেন, যার জন্য তাঁর নিজের দায়িত্বও কম নয়। এর পরেই আমরা দেখি, বন্দী সাজাহানের দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বই ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে পিতৃসত্তার জয় ঘোষণা করেছে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং একথা বলা চলে না, সাজাহান চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বা তাঁর স্বভাবগত দুর্বলতা নেই এবং স্বকৃত কর্মের জন্য তিনি দায়ী নন। কারণ পুত্রস্নেহান্ধতাই তাঁর দুর্বলতা এবং এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বহিরঙ্গিক জীবনে বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং বন্দী হলেও দুই বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্বে সাজাহান চরিত্র উত্তাল। পুত্রদের হারিয়ে, পৌত্রকে হারিয়ে তিনি বিপর্যস্ত। সাজাহান তাঁর ভগ্নদেহতরীটিকে শেষ পর্যন্ত তীরে এনে তুলেছেন বটে, কিন্তু শেষটুকুই তো সব নয়, সমগ্র জীবনের এই বিপর্যয় কম ট্র্যাজিক নয়। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা বোঝবার বুদ্ধি যাদের নেই, তারাই সাজাহানকে নিষ্ক্রিয় বলেন। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন –

"বাহ্য প্রতিক্রিয়া ও সাফল্যের হিসাবে নিষ্ফল হইলেও দ্বন্দ্ব হিসাবে অপূর্ব মহিমায় মন্ডিত।... সাজাহান নাটকের পরিণতি মার্জনায়, কিন্তু এই মার্জনা, ব্যাডলে জাহাকে 'Self restitution of the divided spiritual unity' বলিয়াছেন ঠিক তাহাই। সাজাহান যেভাবে আত্মস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা Violent অর্থাৎ ভীষণ নহে, কিন্তু তাহা যে অনুধাবন করিলেই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। যে স্নেহ-দৌর্বল্যই সাজাহানকে দুঃখযন্ত্রণা আঘাতের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে, সেই স্নেহ-দৌর্বল্যই যে পুত্র তাহাকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিয়াছে, সেই কৃতঘ্ন পুত্রেরই শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্ক পান্ডুর মুখ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু পিতা সাজাহানের একাংশ মার্জনার জন্য অধীর আগ্রহে অগ্রসর হইতেই অন্যান্য অংশ (দারার পিতা, মোরাদের পিতা ও সুজার পিতা) মার্জনার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দেখা দিল। সাজাহানের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ তথা দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ গ্রহণ করিল – মার্জনা এই দ্বন্দ্বের কারুণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। "আর মার্জনা! ঔরংজীব – ঔরংজীব! না, সে সব মনে করব না! ঔরংজীব! তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম" বলিয়া সাজাহান যখন চক্ষু ঢাকিলেন, ক্ষমা আর ক্ষমা থাকিল না; ক্ষমার প্রসন্ন ক্ষান্তি দুঃসহ ক্ষতির আর্তনাদের সহিত এক হইয়া

গেল। ক্ষমা যে এতখানি করুণ হইতে পারে, সাজাহানের ক্ষমা না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না।"

নাটকের সূত্রপাতে আমরা যখন সাজাহানের পুত্রদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কথা শুনি, তখন সাজাহানকে দেখি সম্রাটের কর্তব্য ভুলে পিতৃহৃদয় নিয়ে এই দুঃসংবাদে নিতান্তই চিন্তিত। শেষে জাহানারা যখন উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট মোরাদ আর তার সহকারী ঔরংজীবকে দমনের জন্য পিতাকে বারবার অনুরোধ করছে, দারাও যখন তাঁর আজ্ঞা পাওয়ার জন্য কাতর, তখন পিতা সাজাহানের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ, তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল চিত্রিত করেছেন। এ দ্বন্দ্ব একদিকে দারার প্রতি স্নেহাতিশয্য, অন্যদিকে বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি দুর্বলতা – "ঈশ্বর পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিল কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড় নি?" শেষে যখন দারা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন – "আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ করব না। তাদের বেঁধে পিতা পদতলে এনে দেব। পিতা তখন ইচ্ছা হয় ক্ষমা করবেন। তারা জানুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল কিন্তু দুর্বল নয়" এই কথায় পিতা সাজাহান আশ্বস্ত হলেন এবং সম্রাটের মহিমা প্রতিষ্ঠায় স্নেহকাতর পিতা সাময়িকভাবে পরাজিত হলেন – 'বেশ, তাই হোক! তারা জানুক যে, সাজাহান শুধু পিতা নয়, সাজাহান সম্রাট' বিদ্রোহী পুত্রদের শাস্তি বিধানের জন্য তিনি দারাকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করলেন। কিন্তু তাঁর চিত্তের দ্বন্দ্ব আরো তীব্রভাবে দেখা দিল – "- এ শাস্তি তাদের একার নয়, এ শাস্তি আমারও পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে, পুত্র ভাবে যে পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে।" পরাজিত পিতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্রাটত্বের মহিমাকে পরাজিত করে আবার যেন পিতৃ স্নেহের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করলেন।

একে একে যুদ্ধ এবং শেষে ঔরংজীবের আগ্রায় প্রবেশ আমরা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু স্নেহপ্রবণ পিতা ঔরংজীবের শঠতাকে, মিথ্যাচারিতাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই তিনি বললেন, 'আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা করছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র। আমার লজ্জা, আমার গৌরব।' তার এই কপটতা ও বিদ্রোহকে

সাজাহান কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস – 'আসুক সে, আমি তাকে স্নেহে বশ করব।' ঔরংজীবের ঔদ্ধত্য সাজাহানের পিতৃ-অভিমানকে আঘাত করেছে সত্য, কিন্তু তাঁর বীরত্ব পিতাকে গৌরবান্বিত করেছে। ঔরংজীবের দুই প্রকারের আচরণ সাজাহান-চিত্তে বিপরীত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এত স্নেহ ও বিশ্বাসের বিনিময়ে যখন তিনি জানতে পারলেন, পৌত্র মহম্মদের কাছে তিনি বন্দী, তখন পিতা সাজাহানের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলে উঠলো। সেই কম্পমান ভিত্তিভূমির মধ্য দিয়ে সম্রাট সাজাহানের সত্তা জেগে উঠলো – "একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্ধেক মাটির মধ্যে সেধিয়ে যেত – তার পুত্রের হাতে সে বন্দী! ভেবেছ এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তাকে পদাঘাত ক'রে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান।... আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়তো।" কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে সাজাহান কখনও উত্তপ্ত, ক্রুদ্ধ, কখনো বা কাতর অনুনয়ের দ্বারা নিজের অসহায়তার ক্ষোভে আত্মপীড়ন করে, কখনও হতাশায় ভেঙে পড়েছেন কখনও বা সম্রাটের মহিমা নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি খুঁজেছেন – "আমি আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট সাজাহান এ ভারতবর্ষ এতদিন ধরে' এমন শাসন করে' এসেছে যে একবার তাও সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে পুড়ে যাবে। আমি স্বয়ং সম্রাট সাজাহান... এ বাতুলের প্রলাপ নয়।" কিন্তু তাতেও সাজাহান ঔরংজীবকে শায়েস্তা করবার কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজে পেলেন না। সম্রাট সাজাহান শুধু নন, পিতা সাজাহানও যেন পরাজয়ের গ্লানিতে হাহাকার করে উঠলেন – "পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না, বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না! তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর, তারা সব শিশু-শয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো, তাদের সকালে বিকালে জোরে কশাঘাত কোরো, তাদের সারাজীবনটা চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে রেখো...তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে তো বুক ভেঙে ফেলো, চোখে জল আসে তো চোখ উপড়ে তুলে ফেলো, আর্তনাদ করতে ইচ্ছে

হয় তো নিজের টুটি চেপে ধরো।" আঘাতের পর আঘাতে সাজাহান ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা নয় আত্মবিনাশ – এই পীড়নে ও আত্মদ্বন্দ্বে সাজাহান ক্ষতবিক্ষত 'একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে যাই – তারপর কোথায় যাই – কিছুই যায় আসে না।'

সাজাহানের সম্রাটত্বের অস্তিত্বটুকু শুধু ঐ নামটুকুর মধ্যে। তিনি জীবিত থাকতেও ঔরংজীব যে সম্রাট হয়ে বসতে পারেন, এ যেন সাজাহান শুনেও বিশ্বাস করতে পারছেন না – "আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী – নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন – একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট সাজাহানের আজ এ কি অবস্থা!" বিভ্রান্ত সাজাহান ক্ষোভে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠছেন। এই অন্যায় অবিচার ও নৃশংসতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঔরংজীব সম্রাট হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন এ কথা শুনেও সাজাহান মেনে নিতে পারছেন না। এই সত্যটুকুকে মেনে নেওয়া মানেই তো অবলম্বনটুকু হারিয়ে ফেলা – "এ কি হতে পারে! ঔরংজীব – ঔরংজীব একাজ করতে পারে না। তা'র পিতা এখনও জীবিত – একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!" সম্রাটত্বের গর্ব মহিমা ও বিশ্বাস যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সাজাহানের। শুনেও যেন মেনে নিতে পাচ্ছেন না যে, প্রযারা তাদের প্রিয় সম্রাটকে ফিরে পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করছেন না কেন। শেষে সমস্ত বিশ্বাসের সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ভেঙে গিয়ে সম্রাট সাজাহান পিতা সাজাহানকে নিঃস্ব, ফকির করে দিয়েছে। এরপরে দীর্ঘ সময় সাজাহানকে আমরা আর নাটকে পাই না। পিতা এবং সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্বে সাজাহান যেন সর্বহারা। তারপর সাজাহানকে পাই চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে। সাজাহান শুধু সংসারের প্রতিই বিশ্বাস হারাননি, ঈশ্বরের প্রতিও বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন। বন্দী সাজাহান যখন শুনলেন সুজা আরাকানে পালিয়েছেন, মোরাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত আসন্ন ও দারা ধরা পড়েছে – পিতা সাজাহান অসহায়ভাবে দারাকে বাঁচাবার ঐকান্তিক কামনায় যেন বারবার সংকল্প করছেন – "আমি পাগল হব না।" এই করুণ

আর্তনাদের মধ্যে পুত্রস্নেহাতুর পিতা জাহানারাকে আশীর্বাদ করলেন – "যেন তোর পুত্র না হয়। শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।" দারার সংবাদে সাজাহানের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখা দিল। চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্বে সাজাহান-চিত্ত বিভ্রান্ত। কখনও তাঁর সংলাপে অসংলগ্নতা, কখনও বা স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছেন সাজাহান। ঈশ্বরের কাছে সাজাহান বলেছেন –"দয়া হচ্ছে না পুত্রকে বন্দী করে রেখেছে। যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো – এতখানি অত্যাচার এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সইছে! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা।' কখনও হতাশায় ভেঙে পড়েছেন সাজাহান, কখনও বা সম্রাটত্বের মহিমা নিয়ে গর্জে উঠেছেন। এই চিত্তবিকার তাঁর দ্বৈতসত্তার তীব্র দ্বন্দ্বের পরিণতি। এ বিভ্রান্তি প্রতিকারহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস না করার জন্য যে জ্বালা ও ব্যথা তারই বহিঃপ্রকাশ – 'কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে। আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং পাহারা দিচ্ছি...ঔরংজীব? – তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক তো ঝড় ওঠে।' এরপর উন্মত্ত সাজাহান দারাকে রক্ষা করবার জন্য কাল্পনিক যুদ্ধে মেতে উঠলেন রক্তলোলুপ শয়তানের বিরুদ্ধে। সেই উন্মত্ত অবস্থাতেও তাঁর চিত্তে দুই বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্ব আমরা লক্ষ্য করি। ঔরংজীবকে উদ্দেশ্য করে সাজাহান বলেছেন – "তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত জোড় করে দাঁড়া। কি ক্ষমা চাচ্ছিস, ক্ষমা? ক্ষমা নাই, আমার পুত্র বলে ক্ষমা করব ভেবেছিস। না, তোকে তুষানলে দগ্ধ করবার আজ্ঞা দিলাম।...কি মমতাজ! তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছ। না আমি ক্ষমা করব না, বিচার করেছি।" বাইরের মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎচমকে সাজাহান যেন পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছেন এবং নিজেকেও তার মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইছেন। শেষ দৃশ্যে আমরা উন্মত্ত সাজাহানকে দেখি। কথায় বার্তায় আচরণে যেন জ্ঞান-অজ্ঞানের দুই জগতে সাজাহানের চিত্ত যাতাযাত করছে। সাজাহান সমস্ত ধনরত্ন নিজের অঙ্গে ধারণ করে বেড়াচ্ছেন, পাছে ঔরংজীব সমস্ত চুরি করে নিয়ে যায়। সাজাহানের এই ছন্দে বিলোপের অবস্থায় জহরৎ বলেছে –"জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে জ্ঞানী উন্মাদের মতো করুণ দৃশ্য আর নাই'। নিজের চিত্তবিকার থেকে বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় সাজাহান বলেছেন –

"আমি উন্মাদ হই নাই, জাহানারা! গুছিয়ে বলতে পারি, চেষ্টা করলে গুছিয়ে বলতে পারি। ... কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে যে বেঁচে আছি, তাও আশ্চর্য...সবাইকে মারলে! আর তাদের একটা ছেলেও রইলো না প্রতিহিংসা নিতে।" এই অবস্থায় মঞ্চে ঔরংজীবের প্রবেশ। তাঁকে দেখে সাজাহান যখন 'সম্রাট' বলে সম্বোধন করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে পিতা ও সম্রাটের অভিমান যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঔরংজীব যখন পুত্রের অধিকার নিয়ে তাঁকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করলেন, সাজাহান প্রথমে ভাবলেন, বোধহয় তাঁর মণিমুক্তা নেবার জন্য ঔরংজীব উপস্থিত। জাহানারা যখন ঔরংজীবের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে বলেছেন – "তবে বোধহয় পিতাকে বধ করতে এসেছ! পিতৃহত্যাটা আর বাকী থাকে কেন, হয়ে যাক।" তখন সাজাহান – যে সাজাহান মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পেতে আগ্রহী, মৃত্যুই যার শেষ কামনা – অসীম আগ্রহে বলে উঠেছেন, - "আমায় হত্যা করবে, কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর। তাঁর বিনিময়ে এই সব মণিমুক্ত তোমায় দেব আর মরবার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্বাদ করে মরব। যে মণিমুক্ত নিয়ে ঔরংজীবের কাছে থেকে সাজাহান পালাতে চাইছিলেন, মৃত্যু তাঁর কাছে এমনই কাঙ্ক্ষিত যে, তার বিনিময়ে তিনি সব তাঁকে দিয়ে দিতে চান। কিন্তু ঔরংজীব যখন নতজানু হয়ে পিতার মার্জনা ভিক্ষা করলেন, সাজাহানের সমস্ত প্রতিরক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাই ঔরংজীব যখন মার্জনা চেয়ে বললেন – 'পাপের প্রদাহে জ্বলে যাচ্ছি, দেখুন পিতা! এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পান্ডুর মুখ তাঁর সাক্ষ্য দিবে' তখন পিতা সাজাহানের হৃদয় গলে যায়। পুঞ্জীভূত ক্রোধ স্নেহের প্রবাহে বিগলিত ধারায় বয়ে চলে – 'শীর্ণ হয়ে গিয়েছ সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছ...আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে।' সম্রাট সাজাহান সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে অদৃশ্য, পিতা সাজাহান দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এখানে প্রকাশমান। দারা, সুজা, মোরাদের হত্যাকারী ঔরংজীবেরো তিনি পিতা, সেই ঔরংজীব যখন পিতার পা জড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে, অন্যরা তা মেনে না নিলে সাজাহানের পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা কঠিন – "পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে, আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি। হা রে বাপের মন...এক মুহূর্তেই ক্রোধ গলে জল হয়ে গেল।" পিতা

সাজাহানের এখন শেষ অবলম্বন এই পুত্র ঔরংজীব। তাই তিনি তাঁকে সাম্রাজ্য ভোগ করার অনুমতি দিলেন। পুরনো জ্বালাকে জোর করে ভুলে যেতে চাইলেন – 'ঔরংজীব! ঔরংজীব! না, সে সব মনে করব না। ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।' নিষ্ঠুর অত্যাচারী যতই হোক না কেন, এখন ঔরংজীবই তো সাজাহানের অবলম্বন – "তাদের তো ফিরে পাব না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে। এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি।...একদিন সুখী হতে দে।" ঔরংজীবকে ক্ষমা করার পশ্চাতে সাজাহান - হৃদয়ের যে আলোড়ন, সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বের ,মধ্যে দিয়ে ক্ষমার প্রচ্ছন্ন আলোকে শুধু ঔরংজীবই অভিষিক্ত হলেন না, সমস্ত অতীতের বিক্ষোভ ভুলে সাজাহানও নিজের চিত্তকে সুস্থির করলেন। পিতৃসত্তার যে দ্বন্দ্বে নাটকের শুরু, পরিসমাপ্তিতে সেই দ্বন্দ্বেরও অবসান হল।

১.৮ অনুশীলনী

১) সাজাহান নাটকের প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক অবস্থান আলোচনা কর।

২) সাজাহান নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্রের নির্মাণ নাটকের ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত বোঝাও।

৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যদ্বন্দ্ব আলোচনা কর।

৪) সাজাহান নাটকের আবির্ভাবের দেশ-কাল পরিস্থিতি দ্বিজেন্দ্র মানসের সাকুল্যে বর্ণণা দাও।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

২) কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ,প্যাপিরাস।

৩) দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

৪) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ২ – ঔরংজীব, জাহানারা ও অন্যান্য চরিত্র আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

২.১ ঔরংজীবের চরিত্র আলোচনা

২.২ জাহানারার চরিত্র আলোচনা

২.৩ দারা ও সুজার চরিত্রের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ

২.৪ অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের প্রয়োজনীয় আলোচনা

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১ ঔরংজীবের চরিত্র আলোচনা

ঔরংজীব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, ঔরংজীবকে কোনো কোনো সমালোচক কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁর নামে নাটকের নামকরণ করা সঙ্গত মনে করেছেন। পাঠক সে মত সঙ্গত বলে মনে করে না। সাজাহান নাটকে ঔরংজীব নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও প্রতি-নায়ক বা প্রধান চরিত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র নাটক জুড়ে ঔরংজীবের বারবার নাটকে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ঔরংজীব বাহুবলে যতই নিপুণ হোন, বুদ্ধিবলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, কূটনৈতিক কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতা তাঁর করায়ত্ত। শক্তির চেয়েও ছলে – বলে -কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কপটতা, মিথ্যাচারিতা কিছুই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য নয়। যশোবন্ত সিংহের অধীনস্থ মোগল সৈন্যদের ধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি যেমন বশ করে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, সেইভাবেই নানা কৌশলে তিনি একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর এমনই একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, তিনি সহজেই মানুষের মনোভাব টের

পেতেন। এই অসাধারণ দক্ষতা, বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি থাকার জন্যই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কখনও নিষ্ফল হননি। কার্যোদ্ধার ছিল তাঁর লক্ষ্য। যে কোনো উপায়ই তাঁর জন্য গ্রহণীয় বলে তিনি মনে করতেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা থাকায় ঔরংজীব নানা জটিল সমস্যার মধ্য দিয়েও নিজেকে কাটিয়ে তুলতে পেরেছেন। যশোবন্ত সিংহকে তিনি যথার্থ চিনতেন বলেই পুত্র মহম্মদকে বলেছিলেন – 'আমাদের সৈন্য-শিবির প্রদক্ষিণ করে যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় তো একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না!'

ঔরংজীবের অভিধানে নীতিবোধ বলে কিছু ছিল না। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে কোনো পাপ-কর্মে তিনি লিপ্ত হতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই রাজনীতিতে ঔরংজীব ছিলেন দুর্ধর্ষ। মোরাদকে সুরাপানের ছলে বন্দী করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি। নিজের সমস্ত অন্যায় কর্মকে ঈশ্বরের নামে চালাতে যেমন তাঁর কোনো কুণ্ঠা জাগেনি, তেমনি সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্রে মেতে থেকেও মক্কা যাত্রার ভান করে নিজের অনাসক্তির কথা বলতেও তাঁর বাধেনি। ধর্মের জিগীর তুলে তিনি সমস্ত কাজ সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। জহরৎ ঔরংজীবকে বর্ণনা করেছেন – "ভিতরে এত ক্রুর, বাইরে এত সরল, ভিতরে এত প্রবল, বাইরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত আর বাইরে এত মধুর।" জাহানারার কাছে ঔরংজীব "সৌম্য সহাস্য মনোহর পাষণ্ড। যে মানুষ এমন হাসতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে, এমন মৃদু কথা কইতে পারে যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় করতে পারে যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব করছে।" সাধনবাবুর ভাষায় "নিয়তির মত কঠিন, হিংসার মত অন্ধ এবং শয়তানের মত ক্রুর না হইতে পারিলে নাকি ঔরংজীবের সমকক্ষ হওয়া যায় না।"

এ ঔরংজীবের একদিকের পরিচয়। কিন্তু এইটুকুই ঔরংজীবের সব পরিচয় নয়। ঔরংজীব অবিমিশ্র পাষণ্ড নন। তাঁর আচরণে মাঝে মাঝে দ্বিধা প্রকাশ করে, চিত্তে মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়াতে ঔরংজীব একটি মানবিক চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিবেকের ক্ষীণ পদধ্বনি ঔরংজীবের আচরণকে মানবিক স্পর্শ দান

করেছে। মোরাদ যখন বলেছেন, "আশ্চর্য তোমার কৌশল", ঔরংজীব বলেছেন, "কার্য সিদ্ধির জন্য শুধু একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়, যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।" ঔরংজীব জীবনে কাউকে বিশ্বাস করেননি। এমন কি নিজের পুত্রকেও না। ফলে ঔরংজীবের প্রতি নাটকের সূত্রপাত থেকেই দর্শকের কোনো সহানুভূতি জাগে না।

দারার মৃত্যুদন্ডাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে ঔরংজীব চরিত্রে বিবেকের ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যায়। তাই নিজের ছলনাকে নিজের বিবেকের কাছ থেকে গোপন করবার জন্য ঔরংজীব আপন মনেই বলেছেন – "এ কাজীর বিচার, আমার অপরাধ কি... বিচারকে কলুষিত করব কেন, এ বিচার।" এমন সময়ে দিলদারের প্রবেশ ও সংলাপে ঔরংজীব যেন তাঁর বিবেকের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছেন। দিলদার বলেছেন – "সত্য কথা – আপনি দারার মৃত্যু চান।... জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দেবেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝল। কেবল ভয়ে কথাটি কইল না...সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে যে বিচারের ছল করে আপনি দারাকে হত্যা করিয়াছেন – আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ করবার জন্য।" বিবেকের এই স্পষ্ট উচ্চারণে ঔরংজীব - চিত্তে প্রতিক্রিয়া সাময়িকভাবে দেখা দিয়েছে। দারার মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েও তিনি এই মহত্বটুকুও কাজে লাগাতে চান – "দারা বাঁচুন, আমায় যদি তার জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব। এতখানি পাপ - যাক্ এ মৃত্যুদন্ড ছিঁড়ে ফেলি...না এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্বটুকু কাজে লাগাব।" কিন্তু জিহন খাঁ যখন তাঁকে ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়েছেন, ঔরংজীব যেন বিবেকের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন। একটা যুক্তির অবলম্বনে নিজের অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পেরেছেন – "আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা সইব না। শপথ করেছি, হ্যাঁ দারার মৃত্যুই তাঁর যোগ্যদন্ড।" তারপর ঔরংজীবের চিত্তে যে দ্বিধাটুকু দেখা দিয়েছে, তা শায়েস্তা খাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি... "ঔরংজীব। তবে তোমারো বিবেক আছে।" কিন্তু বিবেকের তুলনায় ঔরংজীবের শঠতা ও মিথ্যাচারিতা এত প্রবল যে, নিজের পাপকার্যের সমর্থনে বিন্দুমাত্র

যুক্তি ঔরংজীব কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। ঔরংজীব-চিত্তে বিবেকের দংশন যদি আরও তীব্রভাবে দেখানো হত, তাহলে ঔরংজীবের দ্বন্দ্বময় চরিত্র আরও বেশি করে দেখানো যেত। তাই দারার মৃত্যু তাঁর চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে, তা খুব জোরালো নয়।

তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে ঔরংজীব শেষ রক্ষা করতে পারেননি। কার্যসিদ্ধির জন্য অন্যকে ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজের চিত্তে মিথ্যাচারিতার আবরণ অক্ষুন্ন রাখতে পারেননি। তাই বিবেকের উত্তপ্ত ছায়ায় দারার ছিন্ন শির, সুজার রক্তাক্ত দেহ, মোরাদের কবন্ধ ঔরংজীবকে অধীর করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর চিত্তের এই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হলেও তা দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। পঞ্চম অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে দিলদারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য – "বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি...অনুতাপ! জানতাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ – নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম – প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়... ভাইকে টুটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না।" শেষ দৃশ্যে তাই আমরা দেখলাম, শীর্ণ দেহে, শুষ্ক পান্ডুর মুখে পিতার কাছে নতজানু হয়ে ঔরংজীব ক্ষমা ভিক্ষা চাইছেন – "আমি পাপী! ঘোরতর পাপী! সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা – এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পান্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে।"

সমগ্র নাটকের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ্য করি ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। তাঁর শঠতা কপটতা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করতে পারে, কিন্তু তাঁকে রক্ত-মাংসের জীবন্ত গতিশীল মানুষ রূপে গড়ে তুলেছে। ঔরংজীবের প্রত্যেক আচরণ ও কথাবার্তা সুনিয়ন্ত্রিত। কোনো কিছুকেই ঔরংজীব তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কথা এবং কার্যকারণ এতই সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত যে তা আবেগবর্জিত ও বাহুল্যবর্জিত। জাগতিক ভোগের প্রতি ঔরংজীবের সংযম ইতিহাস স্বীকৃত। ফলে নারী ও সুরা ঔরংজীব নিজে স্পর্শ না করলেও রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে সহজেই ব্যবহার করে মোরাদকে খতম করেছেন। তাঁর অভিধানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মন্দ কর্ম

বলে কিছু নেই। সিংহাসন লাভের পথে যে-কোনো বাধাকে সরাতে যে-কোনো পন্থা অবলম্বনে ঔরংজীব রাজী। মক্কার প্রতি আসক্তি যেমন তাঁর আন্তরিক নয়, তেমনি সিংহাসন লাভ করে তিনি নিজের শক্তিমত্তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিতৃপ্তির ঘটেছে, কিন্তু জাগতিক ভোগের প্রতি অনীহা তাঁর মত চরিত্রে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য চরিত্র কূটকৌশলী, হৃদয়হীন এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো কর্মই চাণক্যের কাছে গর্হিত নয়। তথাপি চাণক্যের আচরণের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বেদনার কাহিনি। ঔরংজীবের এই অনাসক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ঔরংজীবের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি না। ফলে মনে হয় দাম্পত্য জীবনের প্রেমের অভাব ঔরংজীবকে এইভাবে আবেগবর্জিত করে তুলেছে এবং ঔরংজীব পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকে ভিন্ন আর কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। এই আত্মরতি বা আত্মপ্রীতি ঔরংজীব চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতাও বলা যায়। এমন মানুষ সংসারে থাকেন যিনি শুধু অর্থ উপার্জন করে জান, তা ভোগ করার মানসিকতা থাকে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি প্রেম মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সুগম ও প্রশস্ত করে। ঔরংজীব ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্য অধিকার করলেও তাঁকে ভোগ করার মানসিকতা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তাই কোনো সময়ই ঔরংজীবের চিত্তবিভ্রম ঘটেনি। এবং নিজের হৃদয়ের কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। প্রকৃতি এইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে।

মোরাদকে ঔরংজীব তাঁর যুদ্ধজয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যশোবন্ত সিংহকে সন্দেহ করা, আবার তাঁকে এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগানো, সুজার সঙ্গে মিথ্যা সন্ধি স্থাপন, পুত্র মহম্মদের কাছে মিথ্যা পত্র প্রেরণ সবই তাঁর কার্যকলাপেরই বিভিন্ন দিক এবং সমস্ত কার্যকলাপই ঔরংজীব করেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে ভর করে। আত্মপ্রত্যয়, স্থির-চক্রান্ত করতে পারদর্শী কোনো কিছুই তাঁকে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে নি। "ঔরংজীব তাঁর কার্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারও কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।" দারাকে মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা দিতে তাঁর চিত্তে যে সাময়িক দ্বিধা দেখা দিয়েছিল,

দারার হত্যাকারী জিহন খাঁ প্রযাদের দ্বারা নিহত হলে ঔরংজীব বলেছেন – 'পাপাত্মার সমুচিত দন্ড খোদা দিয়েছেন।' এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য - " যে জিহন খাঁ দারার দয়ায় জীবন দান পেয়েছিল, তারই মুখে ধর্মের দোহাই পাড়া ও ঔরংজীব কর্তৃক তার সমর্থন এবং পরিশেষে ঔরংজীবের মুখেই 'পাপাত্মার সমুচিত দন্ড খোদা দিয়েছেন' দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে দিল্লীর দরবার কক্ষে ঔরংজীব যশোবন্ত সিংহের সম্মুখে কঠোর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই জাহানারার আগমনে তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা বিক্ষুব্ধ সভাসদদের সহজেই নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করে জাহানারাকে নির্বাক করে দিয়েছেন। সুতরাং শুধু যুদ্ধ-কৌশলেই ঔরংজীবের উপস্থিত বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পটুতা লক্ষ্য করা যায় না, কূটনৈতিক সংগ্রামেও তিনি সমান কূশলী। যশোবন্ত সিংহকে নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য ঔরংজীবের নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ, কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনও বা অনুরোধ করে তিনি সিদ্ধ করেছেন। ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদকেও যে ঔরংজীব সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না তাঁর পরিচয় আমরা পেয়েছি তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে। এবং শেষ পর্যন্ত ঔরংজীব মহম্মদের বিশ্বাস সত্য সত্যই হারিয়েছেন। সোলেমানের একটি উক্তিই ঔরংজীব চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়েছে – 'মানুষ এমন মৃদু কথা কইতে পারে আর এত বড় দুরাত্মা হতে পারে।' এবং এইভাবেই শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গীব সাজাহান ও জাহানারার কাছ থেকে মার্জনা ও আদায় করতে সমর্থ হয়েছে।

২.২ জাহানারা চরিত্র আলোচনা

জাহানারা চরিত্রটি 'সাজাহান' নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায়, যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপনায়, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, আবেগের উচ্ছ্বাসে, কঠোরতায়, কোমলতায় জাহানারা চরিত্রটি প্রথম দৃশ্য থেকেই দর্শকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাহানারা এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য কোনো কোনো সমালোচক জাহানারার নামে সাজাহান নাটকের নামকরণ সমর্থন করেছেন। অবশ্য এতখানি আতিশয্যের প্রকাশ বাহুল্য, তবে ইতিহাসের সাথে মিল রেখে জাহানারা চরিত্রের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ইতিহাসে বলে জাহানারা ঔরংজীবকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। আবার তার অন্য ভগ্নি রোশনারা ঔরংজীবের সমর্থক ছিলেন। এবং বরাবর দারার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

নাটকে আমরা জাহানারাকে পেয়েছি দারার সমর্থক রূপে। এ সমর্থন নিছক আবেগ তাড়িত হয়ে নয়, পিতৃ সিংহাসনে জ্যৈষ্ঠভ্রাতার অধিকার যেমন যুক্তিনিষ্ঠ, তেমনি পিতা বর্তমানে অন্যান্য ভ্রাতাদের পিতাকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে আচরণ জাহানারা সহ্য করতে পারেননি। যে বলিষ্ঠ ভাবে জাহানারা নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে তিনি প্রকৃত কন্যারই উপযুক্ত কাজ সে করেছে।তাই কোনো অবস্থায় জাহানারা নিজের তেজস্বী সত্তাকে বির্সজন দেন নি। সে ভাবেই শক্তিময়ী নারী রূপে জাহানারা সমস্ত বিপদের মধ্যে থেকেও কখন মাথা অবনত করেননি। সাজাহান যখন বলেছেন তিনি বিদ্রোহী পুত্রদের স্নেহের শাসনে বশ করবেন, জাহানারা পিতার এই স্নেহাশীষ ও আদরের বাচিকতাকে দুর্বলতা বলে মনে করেছেন। বলেছেন - 'পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকার? পুত্রকে শাসনও করতে হবে' ভ্রাতদ্বন্দ্বের কলুষতার মধ্যে জাহানারা নিজে না জড়িয়েও ন্যায় ও সত্যের যুক্তনিষ্ঠ পথে এগিয়ে গেছেন। পিতা সাজাহান জাহানারার উদ্দেশ্যে যে অনুরোধ রেখেছেন, জাহানারা নিজ আচরণে নাটকের কোথাও তার ব্যতিক্রম ঘটান নি - " তুই ও এর মধ্যে যাস নে? তোর কাজ স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা। এ আবর্জনায় তুই নামিস নে। তুই ও অন্তত পবিত্র থাক"। শঠতা ও ছলনার আবর্তনের মধ্যে থেকেও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জাহানারা নিজ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন নি। তাই বৃদ্ধ অসহায় পিতাকে বারবার জাহানারা উদীপ্ত করে তুলেছেন। মাতা যেমন শিশু সন্তানকে সবসময় আগলে আগলে রাখেন, জাহানারা তার বৃদ্ধ পিতাকে সেরকম সন্তানের মতই আগলে রেখেছেন। সাজাহানের সর্বব্যাপি বিপদের মধ্যে জাহানারার নিত্য সাহচর্যই তার একমাত্র সান্ত্বনা। তাই জাহানারা কখন স্নেহে বিগলিত, কখনও দৃঢ়তায়,বলিষ্ঠতায় প্রেরণাদাত্রী। সাজাহান যখন অসহায় ভাবে হা-হুতাশ করেছেন, জাহানারা সাজাহানের এই স্নেহভাজন বাতুলতাকে দুর্বলতা বলেই

মনে করেছেন। তাই পিতাকে প্রেরণা দেবার জন্য তার আবেগকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিতে জাহানারা সাজাহানকে বলেছেন-

"এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মতো ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পশুর মত বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মতো অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে দয়াময় বলে ডাকলে কিছু হবে না। দলিত ভূজঙ্গের মতো ফণি বিস্তার করে উঠুন। হিত শাবক ব্যাঘ্রীর মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন। অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মতো গর্জে উঠুন।"

জাহানারার এই বক্তব্য নিতান্তই মুখের কথা নয়। তাই দেখি শত বিপদের মধ্যেও জাহানারা কখনও কাতরতা প্রকাশ করে আবেদন নিবেদনের অবমাননাকারির পথ অনুসরণ করেন নি। দিল্লীর প্রকাশ্য দরবারে সবার সম্মুখে ঔরংজীবকে ভৎসনা করতে কুণ্ঠিত হননি। উপস্থিত সভাসদদের ঔরংজীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য জাহানারার ঋজু পথ ধরে অগ্রগমন যতই বলিষ্ঠ হোক, ঔরংজীবের কুটিল চক্রান্তের চাল ছিন্নভিন্ন করে জাহানারা শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করতে পারেননি। বক্তব্য উপস্থাপনায় জাহানারার বলিষ্ঠ ভঙ্গী, ঔরংজীবের শঠতা ও ভন্ডামির কাছে প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু সাময়িক পরাজয় ঘটলেও জাহানারা তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে ঔরংজীবের শঠতা ও ভন্ডামিকে সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছেন তার এই সত্য পথের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। এখানে জাহানার শুধু দৃঢ়তাই প্রকাশ পাই নি, তার বাকপটুতা সহজেই সম্রাট কন্যার মনন শীলতর ইঙ্গিত বহন করে।

এই দৃঢ়তা ও শক্তির জোরেই প্রথম দৃশ্যেই দেখি দ্বিধাগ্রস্ত সাজাহান ও দারাকে জাহানারা তাদের নিজ কতর্ব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন, নাদিরার শঙ্কাকুল কুসংস্কারাছন্ন মানসিকতাকে ধিক্কারে স্তব্ধ করে দিয়েছেন – " নাদিরা, তুমি পরভোজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।" জাহানারা নাটকের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা যেমনই বলিষ্ঠ তেমনিই আবেগস্পন্দিত। তাই দেখি, ন্যায়পরায়ণতা

ও রাজধর্মের সততার প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আবিলতার মধ্যে থেকেও তার কোনও পঙ্ক জাহানারাকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। তাঁর নিঃস্বার্থ কতর্ব্যবোধকে বারবার প্রকাশ করে জাহানারা সম্রাট কন্যার মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বৃদ্ধ পঙ্গু সাজাহানের মুখপাত্ররূপে জাহানারা নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাইরের জগতে যত বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটেছে, সেই সমস্ত সংবাদের বোঝা জাহানারা নিজ স্কন্ধে বহন করেছেন এবং সময় ও সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে তা পিতার কর্ণগোচর করেছেন। এইভাবে পুত্রস্নেহে পিতাকে সমস্ত বিপর্যয় থেকে অন্তরাল করে রাখতে পেরেছিলেন বলেই সাজাহান চিত্তবিকারের প্রান্তদেশে পৌঁছে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েননি। জাহানারার স্বামীপুত্র না থাকার জন্য তাঁর হৃদয়ের স্নেহ প্রেম অবিভক্ত হয়ে সাজাহানের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। জাহানারার ওপর পরম নির্ভরতা জাহানারার স্নেহকে আরও উদীপ্ত করে তুলেছে। তাই সমস্ত বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কা নিজদেহে বহন করে জাহানারা আঘাতের তীব্রতাকে প্রশমিত করে তা সাজাহানের কর্ণগোচর করেছেন। নাটকের আমরা এমন দৃশ্য পাই না, যেখানে জাহানারা ব্যতিরেকে সাজাহান মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছেন। জাহানারা চরিত্রে এই কোমলে কঠোরের মিশ্রিত রূপ আমাদের যেমন বিস্মিত করে তেমনিই শ্রদ্ধা আকর্ষণও করে। এই বিপরীত উপাদানে গঠিত হয়ে জাহানারা চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তাঁর দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্ব স্নেহ-প্রেমের দ্বারা আবেগ স্পন্দিত বলে জাহানারার চরিত্রটি নিষ্করুণ হৃদয় বর্জিত হয়ে ওঠে নি। তাঁর কঠোরতার অন্তরালে একটি সত্য সবসময় সক্রিয় ছিল, এই শক্তিতেই ঔরংজীবের মতো কূটকৌশলীকে একমাত্র জাহানারাই প্রচন্ডভাবে আঘাত দিতে পেরেছেন, জনৈক্য সমালোচক জাহানারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – "তাঁর ধীরতা, বাস্তব-বুদ্ধি, চারিত্রিক স্নিগ্ধতা ও দৃঢ়তার চরম পরীক্ষা ঘটেছে অন্তিম দৃশ্যে সাজাহানের অনুরোধে ঔরংজীবেরর প্রতি ক্ষমা বাক্য উচ্চারণে। হত্যা সন্ধেহ ষড়যন্ত্র কৃতজ্ঞতা অবিশ্বাসের আবর্তমান ঘূর্ণির কেন্দ্র মোঘল অন্তঃপুরে যার আশৈশব অধিষ্ঠান, শোণিত ধারার মধ্য দিয়ে যে সহজে তৈমুর বংশের দোষ-গুণের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যার জীবন সাজাহানের

রাজত্বকালে জড়িয়ে গিয়েছিল, সে যে কেমন করে নারী সুলভ সুচিতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা এবং সেবা ও শ্রুশ্রুষা ও আত্মত্যাগের শ্লাঘনীয় বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন স্থান দিয়েছেন।।"

২.৩ দারা ও সুজার চরিত্র পর্যায়ক্রমিক আলোচনা

দারা চরিত্র আলোচনা

সাজাহানের চারটি পুত্রের মধ্যে দারা জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস বলে, দারা ছিলেন পিতৃভক্ত সন্তান, পুত্র স্নেহাতুর পিতা, প্রেমিক স্বামী ও কবি। ধর্ম সম্পর্কে তার উদারতার পরিচয় পেয়েছি। Dara was a loving husband, a doting father and a devoted son." 'সাজাহান' নাটকে দারাকে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ভাবেই চিত্রিত করেছেন। দারার সাথে ভাই দের বিশেষ করে ঔরংজীবের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ঔরংজীব দারাকে ইসলামবিরোধী কাফের বলতেন। ইসলামের নামে তিনি দারার প্রাণদন্ডের আদেশ দেন কেননা তিনি দারার উদারতাকে ইসলাম বিরোধী মত ও পথ হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। দারা হিন্দুদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি নাকি তার আংটিতে হিন্দি অক্ষরে প্রভু কথাটি লিখে রেখেছিলেন। নমাজ বা রোজা কে তিনি তেমন গুরুত্ব দিতেন না। দারা উপনিষদের ফার্সি অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ দারা শুধু কবি ছিলেন না, তিনি সাহিত্য শিল্প ও দর্শনকে সমান ভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়তেন ও অনুধাবন করতেন। ফলে বেদান্ত ও সুফী চর্চা তার কাছে সমান ভাবে গুরুত্ব পেত। হিন্দু সাধক লালদাস ও মুসলমান ফকির সরমদ উভয় কেই তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। ইতিহাসে এইসব কথা বলে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কাহিনিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

দারার রাজনৈতিক জ্ঞান সেইঅর্থে ছিল না সত্য, তবে তাকে রাজনীতজ্ঞও বলা চলে না। সাজাহান পীড়িত হয়ে পড়লে দারা অধিকাংশ সময়ে তার রোগ শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন। পিতার নামে ফরমান জারি করতেন। কিন্তু অন্যদিকে ঔরংজীবের অনুগতদের পদচ্যুত করে নিজের সমর্থকদের বিভিন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের

ক্ষমতা বাড়াতেন। ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়। দারা পিতার কাছ থেকে যেমন তার সেবায় নিরত থাকতেন,অন্যদিকে সুকৌশলে ব্যবস্থা করেছিলেন, জাতে রাজধানীর কোনও চিঠিপত্র ভাইদের কাছে না পৌঁছোয়। ফলে গুজব অতিরঞ্জিত হয়ে ভাইদের কানে পৌঁছোয় যে সাজাহান মৃত। তাতে শেষ পর্যন্ত দারারই ক্ষতি হয়।

দারা মনে প্রাণে উদার। খাঁটি মুসলমানের মতোই তিনি দীক্ষা নিয়েছেন মুসলমান সাধক মিঞা মীরের কাছে। স্বধর্ম ইসলামকে ত্যাগ না করেও তিনি চেয়েছিলেন সর্বধর্মমতের উদার ক্ষেত্রে তাদের সারমর্ম উপলব্ধি করে সমন্বয় সাধন করতে। তাই দারা বলেছেন – "আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা করতে।" এই উক্তি তাঁর নিতান্ত মুখের কথা নয়, পরেও তাঁর সংলাপে এই মনোভাবেরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত সরল প্রজা-সৈন্য গোঁড়ার দিকে দারার পক্ষে ছিল – "দারার জন্য তারা বালকের মতো কেঁদেছে।" দারার এই মহত্ব দেখেই বোধ করি দিলদার বলেছেন – "...একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গিয়েছে।..."

দারার এই মানসিকতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ঔরংজীব-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর একটা মূলগত প্রভেদ রয়েছে। ইতিহাসের দারা যতখানি সংসার-বিমুখ, তার চেয়েও অনেক বেশী সংসার-বিমুখ ও বৈরাগ্যের মানসিকতা নিয়ে নাটকে প্রকাশ পেয়েছেন। দারা এবং ঔরংজীব পরস্পরের প্রতি বরাবরই অসহিষ্ণু ছিলেন। পিতার কাছে থাকার জন্য দারার খানিকটা নাবালকত্ব ছিল, যার জন্য ঔরংজীবের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় দারা বারবার পরাজিত হয়েছেন। কারণ ঔরংজীব দাক্ষিণাত্য শাসন করতে গিয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি, কূটনৈতিক-জ্ঞান, লোকচরিত্র অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার যাবতীয় কৌশল সহজেই করায়ত্ত করতে পেরে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। যার ফলে শত্রু-মিত্র পার্থক্য করার ও রাজ্য-পরিচালনার কূটকৌশল দারার তুলনায় ঔরংজীব অনেক বেশী আয়ত্ত করেছেন। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দারার বেশী ছিল না।

সাজাহানের পক্ষপুটে থাকার জন্য পিতার প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁকে রাজ্য শাসনে অনেকখানি সহায়তা করেছে। দারার রাজ্য লাভ নিতান্তই অনুগ্রহলব্ধ কিন্তু ঔরংজীবের

রাজ্যলাভ স্বোপার্জিত। ফলে রাজ্য-শাসনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দারা এগিয়ে জাননি বলেই রাজকীয় অভিমানে স্ফীত এবং রাজসম্মান সহজলভ্য বলেই অপরিমিত ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সহজেই লাভ করতে পেরেছেন। বাহুবল ও বুদ্ধিবলে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে ভাগ্য-লক্ষ্মীকে যে লাভ করে নিতে হয়, এ ব্যাপারে ঔরংজীবের যতখানি প্রস্তুতি ছিল, দারার তা ছিল না। তাই কূটনৈতিক জ্ঞানে সম্রাট-পুত্র বা ভবিষ্যৎ সম্রাট হবার কোন মানসিকতাই দারার ছিল না। ছিল না রাজ্য জয়ের বাসনা, ছিল না কঠোর হস্তে রাজ্য শাসনের পরিকল্পনা। ফলে নিছক সাধারণ মানুষের মতোই মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন, সাধারণ সুখে-দুঃখে আন্দোলিত দারা সাধারণ প্রযার কাছে প্রণয়ের নৈকট্য লাভ করেছেন। ঔরংজীবের মত সম্ভ্রমের দূরত্ব বযায় রেখে তিনি চলতে পারেননি। দারা পরিশীলিত মনের অধিকারী হয়ে মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন চরিত্ররূপে নাটকে ধরা দিয়েছেন। তাই নাটকে তাঁর বিপর্যয়-দর্শনে দর্শক চিত্ত বেদনায় হাহাকার করে ওঠে। নাদিরার মৃত্যুতে দারা এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, His judgement & predeuce were entirely gone এই দারাকেই আমরা দেখেছি দিল্লীর রাজপথে দীনবেশে হস্তিনীর পৃষ্ঠে যেতে। মৃত্যুর পূর্বে দারাকে বলতে শুনেছি, - 'ঈশ্বর! পূর্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম।'

দারার উপস্থিতি নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে করুণ রসের সৃষ্টি করেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পাই, দারা সাম্রাজ্যলাভ সম্পর্কে আগ্রহী নন। দারা বলেছেন – 'ভগবান না পিতা যে আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী...আমি এ সাম্রাজ্য চাই না।...ভাববেন না পিতা যে ভাইদের কারুকে পীড়ন বা বধ করব না। তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেব' প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে আমরা জানতে পারি- 'আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন।' এর পরেই আমরা পাই দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে। যুদ্ধে পরাজিত দারা তখন রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশে স্ত্রী নাদিরা ও পুত্রকন্যাসহ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিজের স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত। দুঃখে ও চরম বিপর্যয়ে তবুও দারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। "ঈশ্বর! রাজাধিরাজ তুমি আছ... ঈশ্বর! তোমাকে অনেক বার স্মরণ করেছি। কিন্তু

এমন দুঃখে এমন দীনভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে আর কখনও ডাকিনি। দয়াময় রক্ষা কর।' হয়তো এই বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত তাদের তৃষ্ণা দূর করেছে। সমগ্র দৃশ্যটি হাহাকারের বেদনায় সমাচ্ছন্ন।

তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে আবার দারাকে পাই আমেদাবাদে। এখানে দারা যেন খানিকটা নিজের প্রতিও নিষ্করুণ – "যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাতো, সে নগর হতে নগরে প্রতাড়িত হয়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী।" দারা বলেছেন – "ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার করব না... সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে। আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত করতে পারি, যুদ্ধ করব।" প্রেমিক দারা ঘটনা-বিপর্যয়ে এমনই বিভ্রান্ত যে, নাদিরার সামান্য উদ্বেগাকুল উক্তিতে অপব্যাখ্যা করে নাদিরার প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়েছেন। এইসব দৃশ্যে দারাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার বারবার করুণ রসের সৃষ্টি করেছেন। দারা যে স্নেহপ্রেম পরিমন্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি।

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দারাকে আবার পাই নাদিরার মৃত্যু দৃশ্যে। এই দৃশ্যে দারা নিতান্তই পত্নী-বৎসল স্বামীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কোন রাজকীয় ঘনঘটার দ্বারা দারার মানবিক চরিত্রটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়নি। চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে দারার মৃত্যুতে দিলদারের মত জ্ঞানী ব্যক্তিও চোখের জল সংবরণ করতে পারেন নি – 'এ বড়ো মহিমময় দৃশ্য' দিল্লীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ও কূটনৈতিক চক্রান্তে স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিসম্পন্ন মানুষকেও স্বার্থের যূপকাষ্ঠে কিভাবে বলিপ্রদত্ত হয়, দারার চরিত্র সেই সত্যকেই প্রকাশ করেছে। তাঁর মৃত্যুতে বিস্ময়চকিত দর্শকচিত্ত বেদনাময় ও করুণায় কাতর হয়ে পড়ে।

সুজার চরিত্র আলোচনা

সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা তাঁর ভাইদের থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র চরিত্রের। সাজাহানের চারটি পুত্রই চার পৃথক মানসিকতার অধিকারী। নাটকের সূত্রপাতে সাজাহান-দারা-জাহানারার সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন আসন্ন ভ্রাতৃবিরোধের জটিলতা ও দ্বন্দ্বের আভাস সূচিত হয়েছে। দারা পিতাকে জানিয়েছেন – "সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্তু সে এখনও সম্রাটের নাম নেয়নি..." পুত্রদের

বিদ্রোহ দমন করতে স্বাভাবিক কারণে সাজাহানের অনুমতি নিয়ে দারা বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন দিকে পাঠালেন। সুজার বিরুদ্ধে পাঠানো হলো দারার জ্যৈষ্ঠপুত্র সোলেমানকে। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যোগ দিলেন দুজন সুদক্ষ সেনাপতি – রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ। ইতিহাস বলে, জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে সোলেমান কাশীর কাছে বাহাদুরপুরে সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফ্রেরুয়ারী। নাটকও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সুজার সঙ্গে খাজোয়ার যুদ্ধের আগে যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনির বর্ণনা নাটকে পাই। এই যুদ্ধেও কাশী ও পাটনা হয়ে মুঙ্গের আসেন – এ ঘটনাও নাটকে বর্ণিত হয়েছে। মালদহের নিকট মিরজুমলার কাছে সুজার পরাজয় ও জামাতা মহম্মদের সুজার পক্ষ ত্যাগের ঘটনাও নাটকে পাই। সর্বস্ব হারিয়ে সুজা ঢাকায় পৌঁছলেন ১২ই এপ্রিল, ১৬৬০। কিন্তু আরাকানে এসে তিনি সেখানকার রাযাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন দখল করতে চান। কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং রাজা সুজাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সুজা সেখানে থেকেও পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেখানে মগদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

দীর্ঘ একুশ বছর(১৬৩৯-১৬৬০) বাংলাদেশের শাসনকর্তা থাকার ফলে সুজা বিলাসী হয়ে পড়েন। ফলে রাজ্যশাসনের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তি তাঁর একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। নাটকেও আমরা সুজাকে পাই লঘুচরিত্র ও সঙ্গীতপ্রিয়, যুদ্ধোন্মাদ, দাম্ভিক চরিত্র হিসেবে। সে যুগের সোনার বাংলার নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে তিনি বিলাসিতা ও প্রমোদের প্রতি, নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে ইতিহাসের বক্তব্য হল - ...Shuja's health was impaired by his twenty year's residence in Bengal and in the end he lost the spirit of enterprise and capacity for persistent exertion for which he had been in early youth. This decline was promoted by his love of intellectual refinement and his aesthetic taste, till at last he ceased to be a man of action তবে এই সঙ্গে একথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, পিয়ারার মত

প্রেমময়ী পত্নী পাওয়ার ভাগ্য হয়েছিল বলে সুজা মোরাদের মত বিলাসিতায় ভেসে যেতে পারেননি। পত্নীপ্রেম তাঁর রক্ষাকবচ।

সুজার মধ্যে রাজকীয় অনেক গুণ হয়তো সুপ্ত ছিল, কিন্তু বাংলার অনাবিল তরঙ্গবিহীন জীবনস্রোতে তা যথোচিত আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি। তাছাড়া সুজা বাংলার মসনদ অর্থাৎ মন্ত্রণাগার ও গৃহাঙ্গনের শান্ত অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে কোনো ব্যবধান রাখতে পারেননি। কারণ পিয়ারা সুজাকে বলেছেন –

'বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও না কর্তে, যুদ্ধ কর্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি – যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।'

কিন্তু সুজার কথাবার্তায় যতখানি গর্জন দেখি, আচরণে ততখানি বর্ষণ দেখি না। দারার পুত্র সোলেমান বলেছে – "কাকা প্রকৃত যোদ্ধা।" এ কি আবেগবশে? তাই দেখি, পিয়ারার সঙ্গে সুজা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে পরামর্শ করেছেন।

ফলে সুজা ও পিয়ারার মঞ্চে একত্র আবির্ভাবে সমগ্র পরিমন্ডলে একটা লঘু, স্বচ্ছন্দ, চলমান জীবনাবেগ লক্ষ্য করা যায়। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের শাসরুদ্ধকারী, অস্বস্তিকর ঘটনাবলী থেকে সুজা ও পিয়ারার কথাবার্তা এবং আচরণ যেন খানিকটা বিরতি দিয়েছে। হাস্যের আলোকোজ্জ্বল ছটায় এই কলুষময় অন্ধকার পরিবেশ সাময়িকভাবে যেন বিদায় নিয়েছে। তাই বোধ করি সুজা পিয়ারাকে বলেছেন – 'পিয়ারা, তুমি কি কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নামবে না?'

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। দারা ও নাদিরার শোকাবহ দৃশ্যাবলীর পাশে সুজা ও পিয়ারার দৃশ্যাবলী সংস্থাপিত করে নাট্যকার যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে উভয়ই দর্শকের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে আমরা সুজা ও পিয়ারাকে প্রথম দেখি কাশীতে সুজার সৈন্য-শিবিরে। এই দৃশ্যে আমরা দেখি, সুজার যুদ্ধস্পৃহাকে। পিয়ারা তাকে লঘু কথাবার্তার দ্বারা দমিত করে রেখেছেন। সুজা আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পিয়ারার এই লঘু আচরণ যুদ্ধোন্মত্ত সুজাকে সংযত করে তুলেছে। এর পরে আমরা সুজা ও পিয়ারাকে আবার পাই দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে মুঙ্গেরের দুর্গ প্রাসাদ মঞ্চে। এখানে দেখি

পিয়ারাকে নানাভাবে সুজাকে নানাভাবে সংযত করার চেষ্টায় রত। সাম্রাজ্যলাভের মোহ, ভ্রাতৃত্বের দ্বন্দ্বময় কলুষতা থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিভাবে প্রেম ও শান্তির মধ্যে স্বছন্দে বিরাজ করা যায়, পিয়ারার সেটাই বড় আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যই তাঁর আশঙ্কা – 'হয়ত যা আমাদেরই তা পাব না, যা আছে তা হারাব। কি হবে সাম্রাজ্য, নাথ। আমাদের কিসের অভাব? এর পরে আমরা সুজাকে পাই তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে খিজুয়ার সুজার শিবিরে। এখানেও দেখছি সুজার যুদ্ধ উন্মত্ততা পিয়ারার প্রেমময়তার স্নিগ্ধালোকে দূরীভূত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে আমরা সুজাকে আবার পাই। সেখানে ঔরংজীবের পুত্র সুজার কন্যাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও সুজা কঠোরভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি ঔরংজীবের দ্বারা বিতাড়িত সুজা আরাকান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছেন। এই দৃশ্যে সুজার দাম্পত্যপ্রেম আরও বেশী স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে দর্শকচিত্তে ধরা দিয়েছে। আরাকানরাজ পিয়ারাকে আকাঙ্ক্ষা করায় সুজা পত্নীপ্রেমে আবেগমথিত হয়ে বলেছেন –'তুমি আমার রাজ্য, সম্পদ, সর্বস্ব। ইহকাল পরকাল।''

আরাকানরাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে সুজা ও পিয়ারার সুখী দাম্পত্যজীবনের বিষাদময় পরিণতি দর্শকদের অশ্রুসজল করে তোলে। এই দৃশ্যে আমরা পাই, পিয়ারার হাস্যমুখরতা উদগত অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্রাজ্য লাভের জন্য যে পিয়ারা যুদ্ধ করতে চায়নি, আজ আরাকানরাজের কু-প্রস্তাবে সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধকে বরণ করে নিয়েছে। পিয়ারাকে বাদ দিয়ে সুজাকে একাকী নাটকে দেখা যায়নি। মনে হয়, এই দম্পতি যেন একটি রূপে প্রকাশিত – একে অন্যের পরিপূরক।

২.৪ প্রয়োজনীয় অপ্রধান চরিত্রগুলির বর্ণনানুক্রমিক পর্যালোচনা

নাটকের মূল ঘটনা কেন্দ্রীয় চরিত্রের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। মূল চরিত্রকে বিকশিত করে তুলতে এবং মূল কাহিনিকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে উপকাহিনি এবং আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলির সাহায্য দরকার হয়।

প্রধান চরিত্র বা মূল ঘটনা অপ্রধান চরিত্রের সাহায্য ছাড়া কখনই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। বৃক্ষের সৌন্দর্য পত্রপুষ্প ডালা নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র নায়ক - নায়িকা নিয়ে কোনো সংসার গড়ে ওঠে না। এই সব অপ্রধান চরিত্রের কাহিনিগত সার্থকতা হচ্ছে ততখানি, যতখানি তাঁর মূল কাহিনির অগ্রগতিতে সাহায্য করে বা মূল চরিত্র-বিকাশে অংশ গ্রহণ করে। এই নাটকে প্রধান চরিত্রগুলির পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসের এই ঘটনাপূর্ণ অধ্যায়কে পল্লবিত করে তুলেছে। এঁদের মধ্যে দিলদার, মোরাদ, নাদিরা, পিয়ারা, জহরত, সোলেমান, সিপার, মহামায়া, যশোবন্ত ও জয়সিংহ এবং মহম্মদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দিলদার

দিলদার সম্পর্কে নাটকের পরিচয়লিপিতে উল্লেখ আছে – ছদ্মবেশী জ্ঞানী। চরিত্রটি মূলতঃ অনৈতিহাসিক এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিক সৃষ্টি। চরিত্রটিকে যেভাবে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে এই চরিত্রটির অন্তরালে ইতিহাসের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যায়। পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে দিলদার ঔরংজীবের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন – "আমি মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ" তাতে বিস্মিত ঔরংজীব বলেছেন – "নিয়ামৎ খাঁ হাজী! এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ"। তাঁর উত্তরে দিলদার নিজের পূর্ণ পরিচয় ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন – "আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ । শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটোনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ থেকে বেরোচ্ছি – মনে হয় যে, সেটুকু না নিয়ে গেলেই ছিল ভালো..."

দিলদারের পরিচয়লিপিতে 'দানেশমন্দ্' শব্দটির অর্থ বোধ করি, ধর্মাত্মা। ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করলে সেখানে জেসব মুসলমানেরা বসবাস করতে আসেন, তাদের মধ্যে-

'বড়ই দানিসবন্দ্ কাহারে না করে ছন্দ

প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি

ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।।'

এই দিলদার চরিত্র ঔরংজীবের চাটুকারিতা করে তাঁর পাপকর্মের সমর্থন করেননি; বরং বিদূষকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন – 'ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কচ্ছিলাম। বিদ্যার এখনোও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। ...আমার ফেরাতে পাবে না ঔরংজীব! – আমি চললাম। ... মনে ভাবছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি। - অধঃপতন! তুমি যত ভাবছো উঠ্‌ছো, সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছোও...'। এই উক্তির মধ্যে বিদূষকের, অনুগ্রহপ্রত্যাশীর চিহ্নমাত্র হয়েছে যাকে ঔরংজীবের মতো চরিত্রের মানুষও কোনো জবাব দিতে পারেননি। সত্যের এমনি শক্তি!

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন – "দানিশমন্দ্ খানের আসল নাম মোল্লা সাফিয়া-ই-আজদি। চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য তিনি পারস্য থেকে ভারতবর্ষ আসেন। সাজাহান তাঁকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন(১৬৫০); সাত বছর পরে তিনি পদে উন্নীত হন। মসির-উল-উমরাতে বলা হয়েছে যে, ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।"

নাটকে পাই, দিলদারের অনুরোধে ঔরংজীব দারার প্রাণদন্ডাদেশ রহিত করতে চেয়েছিলেন, অবশ্য শেষে শায়েস্তা খাঁর পরামর্শে তিনি মত পরিবর্তন করেন(৪/৬)। এ ঘটনা ডঃ যদুনাথ সরকার বর্ণনা করেছেন – "That evening Aurangzeb held a private consultation with his ministers about Dara's fate. Danishmand Khan (Bernier's patron) pleaded for his life, but Shaista Khan...and the Princess Raushanara from the harem demanded his death for the good of the church and state." তাই, দিলদার মূলতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি হলেও এই চরিত্রের পরিকল্পনায় ইতিহাসের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যায়।

দিলদারের প্রথমে মোরাদের বিদূষক হিসেবে নাটকে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর হাস্য-পরিহাস দর্শকের কাছে এমনই অর্থবহ যে, তার ব্যঙ্গের তীব্রতায় দর্শকরা সচকিত

হয়েছে, কিন্তু নির্বোধ মোরাদ তাতে লঘু হাস্যের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু লক্ষ্য করেনি। মোরাদের প্রতি দিলদারের যে বোধ, তাকে নিতান্ত অনুকম্পা বলা যেতে পারে। ফলে মোরাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি-প্রকাশ নিতান্তই কৃপাপ্রদর্শন। কিন্তু ঔরংজীব তাঁকে ঠিকই সন্ধেহ করেছেন। দিলদারের ব্যঙ্গ-পরিহাসে ঔরংজীব তাঁকে নিজের পরিষদের দলভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতেও দিলদারের সত্য- স্বরূপ জানতে পারেন নি, বলেই তাঁকে চাটুকার দলভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই বোধ করি, দিলদার ঔরঙ্গজীবকে সোজাসুজি 'শঠ' বলতে দ্বিধা করেন নি। অবশ্য দিলদার যতই 'দিল-এর' অধিকারই হোন, নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে তিনি বরাবর থাকতে পারেননি। এই ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে এক সময়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। যেমন- মহম্মদকে পত্রের মাধ্যমে নিজ দলভুক্ত করার ষড়যন্ত্র। দিলদার চরিত্রে একটা একাকীত্ব ও নিসঙ্গতা চরিত্রটি রহস্যাচ্ছন্ন করে তুলেছে। দার্শনিক মানসিকতা দিলদার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই মৃত্যুর প্রতি তাঁর এত আসক্তি ও আনন্দ। তবে এটা নিতান্ত বাররের লোক-দেখানো দার্শনিকতা নয়- এর ভিত্তিমূল দৃঢ় ও আন্তরিক। তার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি, কারাগারে বন্দী দারার সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে দারাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজে মৃত্যুকে বরণ করার আকাঙ্ক্ষায়। এর দ্বারা দারার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি মৃত্যুকে নিয়ে তাঁর রোমান্টিকতাও লক্ষ্য করা যায়। দারার দুরবস্থায় বেদনাহত হওয়ার মধ্য দিয়ে দিলদার-চরিত্রের কোমলতা, সহৃদয়তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি মৃত্যুকে বরণ করার আন্তরিক আগ্রহের মধ্য দিয়ে মনে হয়। দিলদার চরিত্রে কোথায় যেন একটা কাঁটা অহরহ তাঁকে বেদনাবিদ্ধ করে চলেছে।

জীবনের প্রতি অনাসক্তি এবং অনাগ্রহ, দিলদার চরিত্রে একটা ঋজুতা দান করেছে, তারই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে দিলদার ঔরংজীবের মতো কূটচরিত্রকে মুখের ওপর স্পষ্ট ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ঔরংজীবকে তিনি বিবেকের কাছে জবাব দিতে বলেছেন। ঔরংজীবের মতো মানুষও দিলদারের সততার শক্তির কাছে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। জীবনের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ

নেই তাঁকে ঐশ্বর্য বা অন্যান্য জাগতিক প্রলোভন দিয়ে যে জয় করা যায় না, এ বোধ ঔরঙ্গীবের ছিল না। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য – 'দিলদার চরিত্রে ব্যক্তের সহজ অব্যক্তের নেপথ্য ক্রিয়ায় বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। দিলদার তাই অস্পষ্ট-রহস্যাচ্ছন্ন' এই মন্তব্যের সবটুকু কি সমীচীন, যথার্থ?

দিলদার চরিত্রটির মাধ্যমে নাট্যকার আর একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। নাটকের মধ্যে লঘু সংলাপে, যার মাধ্যমে নাটকের ভারী আবহাওয়া দূর করতে দিলদার সাহায্য করেছেন। তবে দিলদার নিতান্তই বিদূষক নন। তাঁর হাস্যপরিহাসে অন্তরালে তীক্ষ্নব্যঙ্গবিদ্রুপ এবং সত্য দর্শনের ও উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফলে দিলদারের সংলাপ শুধু হাসায় না ভাবাইও। এখানেই দিলদার চরিত্রের সঙ্গে সাধারণ বিদূষকের পার্থক্য। কোনো কোনো পন্ডিত সমালোচক – Shakespeare- এর Fool চরিত্রের সঙ্গে ও গিরিশ চন্দ্র সৃষ্ট (করিমচাচা) 'সিরাজদৌল্লা' চরিত্রের সঙ্গে দিলদার চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকেন। নাটকের গতির প্রতি দিলদার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা সবসময়ে বসিয়ে রাখতে পারেননি। একবার দারার মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনায়, আর একবার মহম্মদের কাছে লেখা ঔরংজীবের কপট পত্র সুজার পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে দিলদার যেন সত্য সত্যই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই ছদ্মবেশে মোরাদের বিদূষক বা ঔরংজীবের কাছে চাকরি নিলেও এই ছদ্মবেশই এক একবার সত্য হয়ে উঠেছে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ শেষ ঘটনার জন্য মহম্মদের কারাবাস ঘটেছে।

দিলদারকে প্রথম পাই, প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে দিলদার বলেছেন – 'আমি মুখে মোরাদের বিদূষক, আমি হাস্য-পরিহাস করতে যায়, যে ব্যঙ্গের ধুম হয়ে ওঠে।' তাই দিলদারের সংলাপের মধ্যে নিছক ভাঁড়ামির পরিবর্তে তীক্ষ্ন তিরবিদ্ধ বাক্যাবলী প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দিলদার কে পাই দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম প্রথম দৃশ্যে। এখানে দিলদার যে সব ব্যঙ্গার্থক কথাবার্তা বলেছেন তা মোরাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য না হলেও ঔরংজীবের নজর এড়াতে পারেনি। এরপর দিলদারকে পাই তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, এখানেই আমরা প্রথম দেখি বিদূষকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তাঁর সত্য রূপে

ঔরংজীবের প্রতি কঠোর ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছেন। এইখানে দিলদার নিজের ভূমিকার যেন ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেছেন "প্রথমে পাঠক! তারপরে বিদূষক। তারপর রাজনীতিক। তারপরে দার্শনিক।" চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সুজা- মহম্মদের ঘটনায় দিলদারকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়তে দেখি। চতুর্থ অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে দিলদারের কথাবার্তায় যেন ঔরংজীবের বিবেকের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে সাময়িক দ্বিধা। দিলদারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ঔরংজীব তা কাটিয়ে উঠে দারার মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে দিলদারের কথাবার্তায় মৃত্যুবিলাসী একজন দার্শনিক কে পেয়েছি এবং এই রূপেই দিলদার কাহিনি থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে দিলদার ঔরংজীবের কাছে তাঁর সত্য পরিচয় দেবার জন্য দেখা দিয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করে ঔরংজীবের অনুরোধ ও বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে সমস্ত প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছেন।

মোরাদ

সাজাহানের চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র মোরাদ সত্যকারের বংশের কূলাঙ্গার ও অপদার্থ। তাঁর মধ্যে যেটুকু সাহস ও বীরত্ব ছিল, সেটুকু লুপ্ত হয়েছিল তাঁর ভোগবিলাসিতায়, নির্বুদ্ধিতা ও অসংযত জীবনযাপনের জন্য। ফলে কূটকৌশলী ঔরংজীবের বুদ্ধির কাছে সহজেই বলিপ্রদত্ত। এ সবই ইতিহাসে পাওয়া যায়। - "Muhammad Murad Bakhsh, the youngest son of Shahjahan was the black sheep of the imperial family. He had been tried in Balkh, the Deccan, and Gujrat and he had failed everywhere. A foolish, pleasure-loving and impetuous prince, his character had not improved with age." নাটকে দিলদারের উক্তির মধ্যে মোরাদ-চরিত্রের এই স্বরূপ ধরা পড়েছে। এই 'মূর্খ' ও 'বর্বর' মোরাদ সম্পর্কে দিলদার বলেছেন – "মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ আর একদিকে সম্ভোগমজ্জিত, মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ।" মোরাদ শাসনকর্তা হিসাবে নিজের অপদার্থতাই প্রতিপন্ন করেছে। এই নির্বোধ বিবেচনাবর্জিত স্থূল রুচিসম্পন্ন, অসংযত অভ্যস্ত মোরাদ স্থূল বুদ্ধিসম্পন্নও

বটে। তাই দিলদারের ব্যঙ্গবিদ্রূপ – মিশ্রিত সতর্কতা মোরাদকে সচেতন করতে পারেনি। মোরাদ তাঁকে বিদূষকের অসংলগ্ন উক্তি বলে মনে করেছে। তাই তার সাহস ও শৌর্য যতই থাক, স্থূলবুদ্ধি তাকে শোচনীয় পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে।

ইতিহাস বলে, মোরাদ সৈন্যবৃদ্ধির জন্য অরক্ষিত সুরাট লুট করে ও বহু অর্থ সংগ্রহ করে। ঔরংজীবের মতো কূটনীতিজ্ঞ যখন সাজাহানের মৃত্যু সংবাদের যথার্থতা নিরূপণে ব্যস্ত, নির্বোধ মোরাদ কোনো কিছু না বিবেচনা করেই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। ঔরংজীব মোরাদকে সমস্ত সাম্রাজ্য দিয়ে ফকির হয়ে মক্কায় চলে যাবার কথা বলেছেন। স্থূলবুদ্ধি মোরাদকে এ কথায় বিগলিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মোরাদ চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসের প্রতি অনুগত ছিলেন। ধর্মাটের যুদ্ধে মোরাদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়ার পরও ঔরংজীবের ওপর মোরাদের নির্ভরশীলতা কিছুমাত্র কমেনি। মোরাদের পারিষদরা যখন তাকে বোঝালো যে, ঔরংজীবের চেয়ে সে কোনো অংশে খাটো নয়, তখন মোরাদ অভিমানে স্ফীত হয়ে উঠলো। অভিজ্ঞ ঔরংজীব সমস্ত উপলব্ধি করে মোরাদকে ছলনার দ্বারা নিজের শিবিরে নিয়ে এসে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করেন, ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর।

নাদিরা

দারার স্ত্রী। চরিত্রটি কল্যানশ্রী মন্ডিত। সেবাপরায়ণা, চিরন্তন-নারী প্রকৃতি, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ, সতীত্বের মহিমায় উজ্জ্বল নাদিরা চরিত্র। নাদিরার মধ্যে রাজকীয় দম্ভ কোথাও প্রকাশ পাই নি। পরভোজের কন্যা সাধারণ নারীর মতোই আবেগে উচ্ছ্বসিত, সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত। তাই দারা সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখে সে সহজেই কাতর হয়। এ প্রসঙ্গে Julies Caesar -র Calpurnia-র কথা মনে পড়ে। দারাকে নাদিরা বলেছে – 'তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়ায় আমার পরম গৌরব' স্বামীর সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়া যে ভারতীয় আদর্শ, নাদিরার মধ্যে আমরা সেই নারীকেই খুঁজে পাই। স্বামীর বিপর্যয়ের সমস্ত ভার নিজে বহন করে মৃত্যুতেও তাদের পরম সুখ। এই সব চরিত্রে নারীর স্বামীপ্রেম নিছক জৈব বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। 'স্বামী' শব্দটিকে কেন্দ্র

করেই যে আদর্শ ভারতীয় নারী চিত্তে সঞ্চারিত, নাদিরা সেই নারীরই প্রতীক। এই নারী যদিও মোঘল হারেমের, তা হলেও দারার মহিষী রূপে নয়, একটি সংসারের জায়া ও জননী রূপেই তাঁর যা কিছু সার্থকতা, তাই নাদিরা-চরিত্রে ধীর ও গম্ভীর এবং সহজেই দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। নাদিরা চরিত্রকে অবলম্বন করে নাট্যকার করুণ রসের অবতারণা করেছেন। তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে এই করুণ রসের মর্মান্তিক দৃশ্য পাঠক কে অশ্রুসজল করে তোলে। দারার দুর্ভাগ্যে নাদিরা নিজের সম্পর্কে যত না কাতর, দারার সম্পর্কে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন – "আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু, আমি তোমারই জন্য বলছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখো, দেখি নাথ – এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই সুভ্রায়িত কেশ।" নাদিরার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে দর্শকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

পিয়ারা

সুজার স্ত্রী। পতিপ্রেমে, সতীত্বের মহিমায় একনিষ্ঠ ও সততায় চরিত্রটি নাদিরার সগোত্রা। কিন্তু বহিরঙ্গিক প্রকাশে তা ভিন্ন। নাদিরা যদি বলি গম্ভীর, ধীর স্রোতস্বিনী, পিয়ারা তবে উচ্ছলিত নির্ঝরিণী। জীবনের পথে চলতে গিয়ে দু'জনের ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তবে নাদিরা সে পীড়নকে সহ্য করার যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে, অন্যদিকে পিয়ারা হাস্যচ্ছটায়, কৌতুকের আবরণে নিজের যন্ত্রণাকে অনায়াসে বহন করেছে – বাইরের কেউ সে বেদনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেনি। আর তাই পিয়ারাকে আপাত দৃষ্টিতে লঘু চরিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু শেষ দিকে বিপর্যয়ের চরম ক্ষণে তাঁর মধ্যে যে দৃঢ়তা, তেজস্বীতা লক্ষ্য করা যায়, তাতে লঘুত্বের আবরণ ছিন্ন করে, শাশ্বত নারী তাঁর শক্তিময়ী রূপু নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পিয়ারা যর্থাথ প্রেমময়ী, যুদ্ধোন্মাদ ও আত্মাভিমানে স্ফীত সুজাকে সে যুদ্ধের নেশায় মত্ত থাকা থেকে নিবৃত্ত করেছে। সুজা সেটা বোঝেন, তাই তিনি বলেন – 'এই রকম করে সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে'। পিয়ারাও তাঁর এই প্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই হাস্য-পরিহাসে কৌতুকে ও উচ্ছলতায়, গানে নিজের চারপাশকে ভরিয়ে রাখতে চাই। তাঁর কথাবার্তাই অর্থহীন প্রগলভতা প্রকাশ পেয়েছে। এ যেন নিজের জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে জোর করে' ভুলে থাকা। মোঘল-হারেমে এই

প্রেমময়ী নারী যেন বেমানান। ছলনা নেই, মিথ্যাচারিতা নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৌধ রচনার বাসনা নেই। তাই পিয়ারা কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও নেমে আসতে চায় না। সুজা পিয়ারার মধ্যে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি খুঁজে পাই না। সুজার তৃপ্তি যুদ্ধে, তামসিকতার পরিচর্যায়। তাই বোধ করি, পিয়ারার মতো স্ত্রী পেয়েও সুজা পরিতৃপ্ত হতে পারেনি - নিজের ট্র্যাজিক পরিণামকে ডেকে এনেছেন। পিয়ারাকে তাঁর মনে হয়েছে, - "এক হাস্যের ফোয়ারা – একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী-" কিন্তু পিয়ারার এতে কোনো ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই। প্রেমের অফুরন্ত শক্তিতে পিয়ারা সমস্ত তুচ্ছতার উপরে বিরাজ করছে। তাই সুজাকে পিয়ারা প্রেমের অফুরান প্রবাহে অবগাহন করিয়ে স্নিগ্ধ করতে চেয়েছে – সমস্ত বিপর্যয়কে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। সুজার বিপর্যয়ে তাঁর চিত্ত হাহকার করে উঠলেও চোখের জল ও মর্মবেদনাকে কৌতুকে পরিহাসে রূপান্তরিত করে নিজচিত্তে দাহকে সে গোপন করেছে। তাই অগ্নির দাহ তাঁর চিত্তকে যতই পীড়িত করুক, অগ্নির উজ্জ্বলতার দ্বারা সে সুজাকে ও তার পরিবেশকে আলোকিত করে রেখেছে। এখানেই পিয়ারার নারীত্বের মহিমা, পত্নীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোঘল হারেমে এ ধরনের নারী যেন বেমানান। তাই সুজা বলেছেন – "পিয়ারা তুমি কি কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নামবে না।" পিয়ারার আচরণ তাই এই রাজকীয় পটভূমিকায় ঠিক খাপ খাই নি। ধনী-গৃহের গৃহিণী যেমন বিলাসিতায় চটুলতায় নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, পিয়ারার বহিরঙ্গ আচরণ দেখে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর বাক্যধারা যত চটুলই হোক না কেন, চরিত্রটিকে কোনো ভাবে লঘু বলা চলে না। তাঁর প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আরাকান রাজ্যে আশ্রয় নেওয়ার সময়ে। মর্যাদাবোধ সতীত্বের তেজ পিয়ারাকে সাধারণ প্রেমময়ী নারী থেকে মহীয়সী নারী রূপান্তরিত করেছে। আরাকান রাজের হীন প্রস্তাবে ক্ষুব্ধা পিয়ারা বলতে পেরেছে – "এই চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ কর' ক'রে বীরের মতো মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরব! আর পুত্র কন্যারা – তাঁরা নিজের মর্যাদা, নিজে রক্ষা করবে আশা করি।" এই দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত। এই তেজোদীপ্ত,অন্তর্গূঢ় শক্তি মহামায়ার মতো সরব বিজ্ঞাপনে বিঘোষিত না হলেও তাঁর

মহিমা কোনো অংশে নূন্য নয়। এই শক্তির উৎসের মূলে রয়েছে পিয়ারার প্রেম-বোধ। পিয়ারার এই দৃঢ়তাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহামায়ার মতো আরোপিত বা কৃত্রিম বলে মনে হয় না। তাই পিয়ারা প্রেমময়ী হয়েও শক্তিময়ী। সুজা বলেছেন 'পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ ঐ রসিকতা ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্যভূমে তৈরি করেছেন কেন?' পিয়ারা বলেছে - 'তোমারই জন্য প্রিয়তম!'

পরিহাসচিত্ততা তাঁকে লঘু করেছে কিন্তু তা নিতান্তই আবরণমাত্র। আসলে পিয়ারা চরিত্রটি আসলে দৃঢ়তায় মমতায় গঠিত একটি চরিত্র, কুসুমের মত কোমল, আবার প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোর। তাই পিয়ারার দৃশ্যগুলি হাস্যে মুখরিত রেখে মুঘল সাম্রাজ্যের হিংস্র চক্রান্ত ভ্রাতৃ দ্বন্দ্বের স্বার্থপরতা, কূটনীতির অন্ধকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে বাইরের আলোকোজ্জ্বল আকাশ যেন উঁকি দিয়েছে, দর্শক এই দৃশ্যগুলিতে স্বাভাবিক জীবনের প্রাণ বায়ু সংগ্রহ করেছে। তাই মোঘল রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হয়ে পিয়ারা বলেছে – "হয়তো যা আমাদের নাই, তা পাব না; যা আছে তা হারাব।" তবুও পিয়ারা তাঁর দৃঢ়তা প্রেমময়তা শক্তি নিয়ে সুজার চিত্তকে সংযত ও স্বাভাবিক করতে চেয়েছে। ব্যর্থতা বা সাফল্যলাভ তাঁর কাছে গৌণ, প্রেমের সাধনাতেই তাঁর জীবনের সার্থকতা, তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা। সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না করতে, যুদ্ধ করবার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে। তোমায় আমি বেশ চিনি, যুদ্ধের নামে তুমি নাচ।" স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে যে পিয়ারা, আত্মসমান রক্ষায় নিশ্চিত পরাজয় জেনেও সেই মৃত্যুর মুখে সুজাকে ঠেলে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে – এ শক্তি সেই প্রেমবোধে। তাই সুজা মোঘল সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পালিয়ে বেরিয়েছেন বটে, কিন্তু পিয়ারার উপস্থিতি যেন সবকিছু বিপর্যয়কে ভুলিয়ে রেখেছে। পিয়ারা শুধু মোঘল-হারামের ব্যতিক্রম নয়, এক ঝলক উজ্জ্বল আলোর মতো সে সব কিছু রাজকীয় মর্যাদাকে চাঁপা দিয়ে অসাধারণ নারীর মতো সমহিমায় প্রকাশ পেয়েছে এবং দর্শকের হৃদয়ও জয় করেছে।

মহামায়া

মহামায়া চরিত্রটিকে পাই রাজপুত ইতিহাসের একটি প্রতীক চরিত্র হিসেবে। মহামায়া যোধপুরপতি যশোবন্ত সিংহের পত্নী। মহামায়া-চরিত্রের আকর্ষণ তাঁর মুখে সুপ্রযুক্ত দুটি সঙ্গীতেরর জন্য। এই বীরাঙ্গনা যুদ্ধে পরাজিত স্বামীর প্রত্যাবর্তনকে সহ্য করতে পারেননি। তাই দূর্গদ্বার বন্ধ করে তাঁর প্রবেশে বাধা দিয়েছেন, কারণ পরাজিত স্বামীকে বরণ করা রাজপুত রমণীর আদর্শ নয়, আদর্শ চরিত্র মহামায়া তাঁর দেশ-প্রেমের জন্য, রাজপুত নারীর আদর্শ রক্ষার মহিমায় উজ্জ্বল একটি নারী – যার মঞ্চে আবির্ভাবে দর্শককূল আবেগ স্পন্দিত হয়ে করতালি ধ্বনির দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু মহামায়া-চরিত্র কতখানি বাস্তব এ সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। মহামায়া নামকরণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যেন চিন্ময়ী রূপে দেশজননীকে চিত্রিত করেছেন। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে মহামায়ার সঙ্গে দর্শক দের প্রথম পরিচয় ঘটে। এখানে মহামায়া আদর্শ রাজপুত রমণী হতে পারেন, কিন্তু কতখানি বাস্তব সম্মত রাজপুত পত্নী সে সম্পর্কে সন্ধেহ থাকে। যে নারীর স্বামী পরাজিত হয়ে যুদ্ধ প্রত্যাগত সুনে বিনা অনুসন্ধানে দুর্গ দ্বার বন্ধ করবার হুকুম জারি করেন তাঁর আচরণে স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে সন্ধেহ জাগে – যতই তাঁর চারণিদের সঙ্গীতদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করুক না কেন। যশোবন্ত সিংহ নাটকে যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে তাঁকে ভীরু বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তিনি তবে কি স্ত্রৈণ? যুদ্ধ জয় পরাজয় আছেই – ভীরুতাকেই ধিক্কার জানানো যেতে পারে, পরাজয়কে নয়। শঠতার দ্বারা জয়লাভের চেয়ে, বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে পরাজয়ের মধ্যেও গৌরব আছে। সেদিক দিয়ে করলে মহামায়ার আচরণ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বরং তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যের মহামায়ার আচরণ ও ধিক্কার যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের সংলাপের মধ্যে ঔরংজীবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা শুনে মহামায়া বলেছেন – "ঔরংজীবের পক্ষ হয়ে তাঁর শিবির লুঠ করে পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো, এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!"

জহরৎউন্নিসা

দারার কন্যা। জহরৎকে আমরা নাটকের আবেগময় মুহূর্তে বারবার দেখেছি। চরিত্রটি বালিকা এবং সব সময়ে উচ্ছ্বাসের চড়া পর্দায় বাঁধা। তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে রাজপুতানার মরুপ্রান্তে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, নিদ্রিত চক্ষে জল দেখে বলে – "জ্যোৎস্নার মত – রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটা তত উজ্জ্বল দেখেছি।" সিপারকে নানা সময়ে তীব্র বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জরিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বাক্যবাণ – 'পুরুষ তুমি – স্থির স্বরে বলছো, উপায় কি?' পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেও দেখি জহরতের বালিকাবেশে ঔরংজীবকে হত্যা করার জন্য প্রবেশ ও আবেগময় কথোপকথন সামাজিক চিত্তকে নাড়িয়ে দেয়। কবিত্বে ও অলংকার বাহুল্যে জহরতকে এইভাবেই আলাদাভাবে অঙ্কন করেছেন।

সিপার ও সোলেমান

দারার দুই পুত্র। সিপার বয়সে যদিও বালক কিন্তু জহরতের মতই তার সংলাপে বালকোচিত কোনোও লক্ষণ প্রকাশ পাইনি। সোলেমান সেদিক দিয়ে বয়সের তুলনায় পরিণত। সোলেমানের রণখ্যাতি সুবিদিত। জয়সিংহের মতো বিখ্যাত যোদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে সে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে। সোলেমান-চরিত্রের সমস্ত কিছু প্রেরণার মূলে আমরা লক্ষ্য করি তার অকৃত্রিম পিতৃভক্তি। ধর্মাট যুদ্ধে দারার পরাজয়ের ফলে সে সুজার সঙ্গে সন্ধি করে পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। সিপার চরিত্রের মধ্যে বালকোচিত ভাব লক্ষ্য করা যায়, জহরত ও সিপারের কথোপকথনে বিশেষভাবে।

মহম্মদ

ঔরংজীবের পুত্র। সোলেমানের মতই মহম্মদ-চরিত্রের প্রধান শক্তি তার পিতৃভক্তি। এই পিতৃভক্তি এতই অকৃত্রিম যে, শত প্রলোভন এমনকি ভারতসাম্রাজ্য পর্যন্ত মহম্মদকে এই ভক্তি থেকে টলাতে পারেনি। অথচ ঔরংজীব তাঁর পিতৃভক্তি সম্পর্কে কটাক্ষ করলে মহম্মদ বলে, 'আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, তো দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসত এই মহম্মদ। পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস...'। মহম্মদের সততা, সত্যবাদিতা সব সময় মর্যাদা পায়নি। মহম্মদ কোনোদিন

ছলনার আশ্রয় নেয়নি, কিন্তু পিতা ঔরংজীবের শঠতার জন্য অনেকেই মহম্মদকে বারবার ভুল বুঝেছে।

যশোবন্ত সিংহ

যোধপুরাধিপতি। যদিও তাঁর স্ত্রী মহামায়া পরাজিত যশোবন্ত সিংহকে ধিক্কার দিয়েছেন তথাপি যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব ও সাহসিকতা সুবিদিত। এমনকি ঔরংজীব পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছেন – 'কি অসীম সাহসী।' যশোবন্ত রাজপুত গৌরবে সুপ্রসিদ্ধ। ঔরংজীবের ভীতি প্রদর্শন ও ধমকানিকে যশোবন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে বলেছেন – 'যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু ও অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে'। ঔরংজীব যশোবন্তের নির্ভীকতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যশোবন্তের এই নির্ভীকতা অনেকটা বেপরোয়া মানসিকতারই নামান্তর। এই বেপরোয়া মনোভাবের জন্যই তিনি দারার পক্ষ ত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

জয়সিংহ

জয়পুর অধিপতি। তিনি আদর্শের চেয়েও নিজের স্বার্থকেই বেশি মূল্য দেন। তাই জাগতিক লাভ-ক্ষতির হিসেবেই জয়সিংহ তাঁর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। যখন দারা ক্ষমতাসীন ছিলেন, তখন তিনি দারার পক্ষ অবলম্বন করেন। আবার যখনই দেখলেন ঔরংজীবের অধিকারে ক্ষমতার আসন, তখন তিনি অবলীলাক্রমে ঔরংজীবের পক্ষ অবলম্বন করলেন। এ ধরনের সুবিধাবাদি মানুষ ইতিহাসের পাতায় এবং জীবনে অনেক পাওয়া যায়। সে জন্য জয়সিংহ নামেই রাজপুত, আচরণের নয়। তাই জয়সিংহ বলেন – 'আমি কোনোও উচ্চ প্রবৃত্তির ভান করি না। সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কমদামে বেশি পাব, সেখানেই যাব।'

২.৫ অনুশীলনী

১) ঔরংজীব চরিত্রের আন্তরিক দ্বন্দ্ব ঘটনা পরম্পরার নিরিখে বিশ্লেষণ কর।

২) ঔরংজীবকে কি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যাবে? নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

মন্তব্য

৩) জাহানারা চরিত্রের তেজদীপ্ততা নাটকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।

৪) দারা ও সুজার চরিত্র নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনাপরম্পরাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে?

৫) সাজাহান চরিত্রকে কেন কেন্দ্রীয় চরিত্র মর্যাদা দিয়েছেন অনেক সমালোচক?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

২) কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ,প্যাপিরাস।

৩) দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

৪) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ৩- সংগীতের ব্যবহার, ভাষা ও সংলাপের বৈচিত্র্য, ট্র্যাজেডি বিচার

বিন্যাসক্রম

৩.১ নাটকে সংগীতের ব্যবহার

৩.২ ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে বৈচিত্র্য

৩.৩ ট্র্যাজেডি হিসাবে সাজাহানের উপস্থাপনা

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ নাটকের সংগীতের ব্যবহার

নাটকে সংগীতের সন্নিবেশ বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গীতিকার তথা সুরকার যখন নাট্যকার রূপে দেখা দেন, তখন তা আরও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসঙ্গীতের বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়ণ করতে গিয়ে দুদিকে নজর রাখতে হবে। প্রথমত, তাঁর কাব্যমূল্য দ্বিতীয়ত তাঁর নাট্যমূল্য। সঙ্গীতে সুর প্রয়োগ নাটকের ভাব বা আবেগ প্রকাশ করার দিক দিয়ে অনেক সময়ে অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাই সুরগত ও ভাবগত বিচার ছাড়াও নাটকের দিক দিয়ে তাঁর পৃথক মূল্য ও সার্থকতা বিচার করা প্রয়োজন। তবে একথা ভুললে চলবে না, সুরের মাধুর্যে বা ভাবসমৃদ্ধিতে সঙ্গীত উচ্চাঙ্গের হলেও নাটকের দিক দিয়ে ব্যর্থ হতে পারে। আবার সুর ও ভাবের বিচারে ততখানি উচ্চাঙ্গের না হয়েও নাটকীয় তাৎপর্যে তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু সুরসাধক ছিলেন না আজন্ম ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। এ সম্পদ তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাই একাধারে কবি ও সুরকারের সার্থক সমন্বয় লক্ষ করা যায়। আর্যগাথা প্রথম ভাগ এর গানগুলির রচনা ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে। তাছাড়া তিনি ইংলন্ড প্রবাসকালে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। অবশ্য তাঁর গুণগ্রাহী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে আসেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সাধনা ও সুরারোপের পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথের আনুকূল্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সঙ্গীতের প্রাচ্য পাশ্চাত্য সুরের সার্থক সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

পত্নী বিয়োগের পর তাঁর সাহিত্য জীবনে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেই ভাব গভীরতা তাঁর সঙ্গীত রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। একদিকে প্রকৃতি-প্রেম ও মানবপ্রেম মূলক গানগুলির পরিণত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, অন্যদিকে হাসির গান ও দেশাত্ববোধক গান রচনাতেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্বের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে এই দেশাত্ববোধক সঙ্গীত প্রয়োগ লক্ষ করা যায় – বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সাজাহান নাটকে। কারণ তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতগুলি এই পর্বেই রচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে আমরা একাধারে বিষয় বৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্য লক্ষ করি। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় – ভগবান তাঁকে গানের গলা ও সুরের কান দিয়েছিলেন।' গিরিশচন্দ্রের আগে বাংলা নাটকে এ ভাবে গানের সার্থক প্রয়োগ আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলি তাই তাঁর নাটকের প্রাণকেন্দ্র – বিশেষত প্রহসনগুলিতে। অনেক সময় নাটকের মন্থরগতি ও এক ঘেয়েমি কাটিয়ে তোলার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে সার্থক সঙ্গীতের সন্নিবেশ করেছেন।

নাটকে সঙ্গীতের উপস্থাপনার কতকগুলি বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত, কোনো শ্বাসরুদ্ধকারী বা ট্র্যাজিক ঘটনার পর বিরতির জন্য Dramatic relief বা দর্শক মানসিকতাকে প্রশমন করবার অবকাশ দেবার জন্য নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োজন ঘটে। এ ধরনের গান অনেক ক্ষেত্রেই নিছক প্রমোদমূলক হয়। দ্বিতীয়ত, নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত অনেক তাৎপর্য সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। তৃতীয়ত,

সঙ্গীতের সাহায্যে নাটকীয় পরিস্থিতি ও ঘটনাকেও ব্যক্ত করা সম্ভব। চতুর্থত, নাটকের মধ্যবর্তী অনেক ঘটনাবলী যার উপস্থাপনা নাটকে হয়তো নেই, নাট্যকার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলী জানিয়ে দেন বা পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখও এই সঙ্গীতের দ্বারা সাধিত হতে পারে। পঞ্চমত, পাত্র পাত্রী মানসিক দ্বন্দ্ব আবেগ উচ্ছ্বাস, আনন্দ দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি যা স্বগতঃ উক্তির দ্বারা কিছুটা প্রকাশিত হতে পারত তা আরও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় সঙ্গীতের মাধ্যমে।

নাটকে তাই সঙ্গীতের উপস্থাপনা বিশেষ অর্থবহ না হয়ে নিতান্তই যদি আনন্দ দানের জন্য হয়, যার সঙ্গে নাটকের কোনো ভাবেই কোন যোগ নেই, তবে তা নিতান্তই নাটকীয় ত্রুটি। ঐ ধরনের সঙ্গীত বাহুল্য আমরা পুরানো দিনের যাত্রার মধ্যে লক্ষ্য করি। আমরা জানি, নাটকে সঙ্গীত শুধু চিত্ত বিনোদনের জন্য নয়, তা ঘটনার গতি-প্রকৃতির আভাস দেয়, চরিত্রের মানসিকতাকে ব্যক্ত করে, নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না, সে ক্ষেত্রেও সঙ্গীতকে পরিবেশগত সামঞ্জস্যকে বযায় রাখতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে এ ধরনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গিরিশচন্দ্র।

বাংলা নাটকের গোড়ার পর্বে প্রায় সমস্ত নাট্যকারই যাত্রার ঢঙে নাটকে গান সংযোজন করতেন। অবশ্য একথাও ভুললে চলবে না, নাটকে যে একটা চিত্ত বিনোদনের দিক রয়েছে সে সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালও সচেতন ছিলেন। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক পরিমন্ডলে রচিত বলে তাতে সঙ্গীত প্রয়োগের যথেষ্ঠ সুযোগও ছিল। দ্বিজেন্দ্র-গবেষক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'তিনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিলেন মুক্তি-পন্থী। তাই তিনি ছিলেন সুর -বিস্তারের পক্ষপাতী। সুর বিহারের উন্মুক্ত অবকাশ। তাঁর গানকে সহজ স্বছন্দ ও বিলায়িত ও লীলায়িত করে তুলেছে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে তিনি মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কাব্যসঙ্গীত কেবল কণ্ঠবাদন মাত্রই নয়, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাব্য-সৌন্দর্য ও কথারস সৃষ্টির লাবণ্য কাব্যসঙ্গীত রচনায় কাব্য ও সঙ্গীতের যুগ্ম দাবিকে তিনি একই সঙ্গে মিটিয়েছেন। সুর বিহঙ্গ অসীম ভাবের বিস্তীর্ণ আকাশে তাঁর সপ্তপক্ষ বিস্তার করেছে।'

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমসঙ্গীতগুলি ভাবের সৌকুমার্যে এবং সুরের বৈচিত্র্যে বাংলার সঙ্গীত ধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। হাসির গানের রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা ও সুর বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। রথীনবাবু যর্থাথই বলেছেন, - "হাস্যরসের মূলে আছে অসংগতি, এই অসংগতি সুরের ব্যাপারে পরিস্ফুট হয়। কথার সঙ্গে সুরের অসংগতির সৃষ্টি করে, তিনি এই জাতীয় গান সৃষ্টি করেছেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি-বিষয়ক ও স্বদেশপ্রেম মূলক সঙ্গীত গুলিও তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার সাক্ষর বহন করে। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিসঙ্গীত গুলিও স্মরণীয়। এ সব ক্ষেত্রেই তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রাগরাগিনীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকে আমরা সর্বমোট নয়টি গান পাই। তাঁর মধ্যে দুটি গান প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ও চন্ডীদাসের লেখা। এবং বাকী সাতটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের রচনা। এর মধ্যে পিয়ারার মুখে পাই পাঁচটি গান পাই।(তাঁর মধ্যে দুটি বৈষ্ণবগীতি) মহামায়ার চারণী ও চারণ বালকদের মুখে দুটি গান, মোরাদের নর্তকীদের দ্বারা গীত একটি গান এবং কাশ্মীর রাজের প্রমোদ উদ্যানে রমণীদের দ্বারা গীত একটি গান।

১) 'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি' – এ গানটি প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে পিয়ারা গেয়েছেন। কাশীতে সুজার সৈন্যশিবিরে যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এই গানটি গীত হয়। গানটির আদি রূপ পাই আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু পরিবর্তন করে, সাজাহান নাটকে গানটি প্রয়োগ করেছেন। আলোচ্য গানটিতে নায়িকার হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেম-বাসনা, বাস্তব জীবনের সীমাকে অতিক্রম করে প্রেমের এক নিবিড় অনুভূতিতে অসীমে বিলীন হয়ে যেতে চায়। গভীর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও দুটি হৃদয়ের মধ্যে যেন কীসের অভাব, অতৃপ্তি রয়েছে । এ যেন বৈষ্ণব কবির 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া', প্রেমের এই নিবিড় অনুভূতি যেন তাঁর সার্থকতার পথ খুঁজছে।

২) 'সেথা গিয়াছেন তিনিন সমরে'- মহামায়া ও চারণিদের দ্বারা গীত এই গানটি পাই প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে। এই গানটির মধ্যে যুদ্ধের সজীব বর্ণনা ও তেজ দীপ্ত

মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। গানটির ধ্বনি ঝংকারে যুদ্ধের স্পন্দন অনুভব করা যায়। যোধপুর দুর্গে রাজপুত রমণীর বীরত্ব ব্যঞ্জক কণ্ঠে এই গান, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। বীর ও করুণরসের অপূর্ব সমন্বয় গানটিকে পরম আস্বাদ্য করে তুলেছে। সমবেত কণ্ঠে গীত এই গানটি সার্থক যুদ্ধ সঙ্গীত, এই ধরনের গান রচনায় ও সংযোজনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলনীয়। যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে গেছেন কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন – এই সংবাদ শুনে যশোবন্ত মহিষী মহামায়া, তাঁর পরাজিত স্বামীর স্মমুখেই দুর্গ দ্বার বন্ধ করবার আদেশ দিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যুদ্ধে হয় জয়, নয় মৃতুই কাম্য। পরাজিত স্বামীকে বরণ করা রাজপুত রমণীর আদর্শ নয়, মহামায়া চরিত্রে রাজপুত রমনীর তেজদীপ্ত মানসিকতা ও বীরত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এই সঙ্গীতটির মূল পদে –

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির,
ওঠ বীর জায়া বাঁধ কুন্তল মুছো এ অশ্রু নীর।"

৩) 'আজি এসেছি – আজি এসেছি, এসেছি, বঁধু হে' গানটি গীত হয়েছে নর্তকীদের দ্বারা ঔরংজীব কর্তৃক মোরাদকে বন্দী করার পূর্ব মুহূর্তে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে। গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সার্থক ও বিখ্যাত প্রেমসঙ্গীত। নৃত্যের তালে গানের সুর ও ছন্দ এমন একাত্মভাবে মিশে আছে যে, গানটি সে জন্য অপূর্ব সংগতি লাভ করেছে। জনৈক্য সমালোচকের মতে – 'মানবের চিরন্তন বাসনালোকে যে এক অর্ধজাগর মুহূর্তের সৃষ্টি এই জাতীয় কাব্যের লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে এ গান নিঃসংশয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।' জ্যোৎস্নালোকিত, কুসুম সুরোভিত, পাখির কূজনে মুখরিত প্রকৃতির পরমা কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের বর্ণনায় এই সঙ্গীতটি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। এই গানটি নাটকের প্রয়োজনে লিখিত, পৃথকভাবে কবিতা বা গান হিসেবে পূর্বে রচিত নয় – যেমন আগের দুটি গান আমরা পেয়েছি। এই গানটির রচনা সম্পর্কে একটি কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনি প্রচলিত আছে – 'গান লিখিতে দ্বিজেন্দ্রকে বিশেষ কোনো চেষ্টা বা আয়াস করিতে হইত না – অতি সহজেই তিনি যে কার্য সম্পন্ন করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ অধীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে,- সাজাহান নাটক লিখিবার সময় তিনি

একটি স্থান বাদ রাখিয়া লিখিয়া ছিলেন। একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলাল অধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে একটা কি গান দেওয়া যায় বলুন দেখি?' অধর স্থান কাল পাত্র দেখিয়া বলিলেন, একটি রাত্রির বর্ণনা দিন না। দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ - 'আজি এসেছি – আজি এসেছি, এসেছি বধূ হে!...' পঙক্তি বিশিষ্ট সুন্দর গানটি রচনা করিয়া ঐ স্থানে বসাইয়া দিলেন। গান লিখিবার পূর্বে তিনি সুরটি ঠিক করিয়া মনে মনে ভাঁজিয়া লইতেন, পরে কথা বসাইতে তাহার বিলম্ব হইত না...'

৪) দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে মুঙ্গেরের দূর্গ প্রাসাদ। মঞ্চে জ্যোৎস্না রাত্রে পিয়ারা গেয়েছেন জ্ঞানদাসের বৈষ্ণব গীতি। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।" রাধার অন্তর দাহ ও বেদনা এই গীতিটির মধ্যে বাণী রূপ লাভ করেছে। ভাগ্যদোষে সুখ দুঃখে পরিণত হয়, প্রত্যাশা পর্যবসিত হতাশায়। নাটকের দিক দিয়ে বিচার করলেও এর প্রয়োগ সার্থক বলা চলে। পিয়ারার আপাত লঘু চরিত্রের মুখে এই গানটি দিয়ে নাট্যকার যেন ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, সুজার সুখের সংসারে বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া পিয়ারার কথাবার্তার মধ্যেও দু-এক যায়গায় এই অশুভ ইঙ্গিতটুকু ধরা পড়েছে।

৫) এই প্রসঙ্গে চন্ডীদাস রচিত আর একটি বৈষ্ণব সঙ্গীতের উল্লেখ করা যেতে পারে। গানটি পাই চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে। প্রথম দৃশ্যে সুজার প্রাসাদকক্ষে পিয়ারা কর্তৃক গীত – "সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।" এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রাধার পুর্বরাগ ও প্রেমবোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। পিয়ারার ক্ষেত্রে পূর্বরাগ নয়, অনুরাগ মুগ্ধা নারী হৃদয়ের আকুলতা ব্যঞ্জিত হয়েছে। অলৌকিক প্রেমগাথা রাধাকৃষ্ণের লীলারূপ হলেও লৌকিক প্রেমের পরম সত্য ও উষ্ণতা এর মধ্যে অপরূপভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতা শীর্ষক কবিতাটির বক্তব্য স্মরণীয়।

পিয়ারার মুখে এই দুটি বৈষ্ণব সঙ্গীতের প্রয়োগ নিয়ে কোনো কোনো সমালোচক অনৌচিত্যদোষ খুঁজে পেয়েছেন। তাদের মতে মুসলমান হারেমে কিনা বৈষ্ণব সঙ্গীত? অর্থাৎ তাদের মতে বৈষ্ণব না হলে বৈষ্ণব গীতি গাইবে কি করে? তাদের এই কথা মনে রাখা উচিৎ ছিল, প্রথমত অনেক মুসলমান নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও

বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন। বৈষ্ণব কবিতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই জনপ্রিয় ছিল।

দ্বিতীয়ত, একথা মনে রাখা দরকার যে, সুজা প্রায় বিশ বছর বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল – একথা ইতিহাস বলে। তাছাড়া সুজা নিজে সংগীত, নৃত্য, শিল্প-কলা ইত্যাদির পৃষ্টপোষক ছিলেন। সেজন্য তাঁর বেগম সঙ্গীত-রসিকা পিয়ারার পক্ষে তৎকালীন জনপ্রিয় গীত বৈষ্ণব পদাবলী শেখা ও গাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, গানের প্রয়োগের দিক দিয়েও এই দুটি গীত নাটকের স্থান কালের উপযুক্ত হয়েছে।

৬) এরপর আলোচনা করা যেতে পারে, তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে খিজুয়ায় সুজার শিবিরে সন্ধ্যাবেলা পিয়ারার গান – 'আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।' এই গানটি আর্যগাঁথা(দ্বিতীয় ভাগ) অন্তর্ভুক্ত একটি সংগীতের পরিমার্জিত রূপ। এই দৃশ্যের সূত্রপাতে দেখি – 'খিজুয়ার শিবিরে বসে সুজা একটি মানচিত্র দেখতে ব্যস্ত, এমন সময়ে মালা হাতে পিয়ারা এই গানটি গাইতে গাইতে ঢুকে সুজার গলায় তা পরিয়ে দিলেন। প্রকৃতির অনাবিল মধুর পরিবেশে প্রেমের আকুলতা ও আত্মনিবেদন প্রত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এখানে প্রকাশিত। তাদের প্রেম-জীবনের স্মৃতি গানটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে – '...কবি সুজামুঠা... মহালের কার্যের জন্য সেটেলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়া, আসিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল কাজলাগড়ের এই দীঘিকাটির পার্শ্বে একটি বাংলোতে সপরিবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁর সুপরিচিত সঙ্গীতটি 'আমি সারা সকালটি বসে, বসে...' রচনা করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি, একদিন প্রত্যুষে কবি রাজকার্য উপলক্ষ্যে মপস্বলে বাহির হইয়া গেলে কবিপত্নী তাঁহাদের বাংলোর সম্মুখস্থিত প্রাচীন বকুলবৃক্ষ তল হইতে ফুল কুড়াইয়া লইয়া সমস্ত সকাল বৃক্ষমূলে বসিয়া একছড়া মালা গাঁথিয়া ছিলেন এবং স্বামী কর্মক্লান্ত দেহমন লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহার গলায় ঐ সাধের মালাটি পরাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন এই সঙ্গীতটি রচনা করিয়া সেই মধুর স্মৃতিকে তাঁহার নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত

করিয়া...উপহার দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'সাজাহান' নাটকে সঙ্গীতটি পিয়ারাকে দিয়া গাওয়াইয়াছেন।..."

৭) তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে পাই পিয়ারার গান – 'তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি...এ' এই গানে প্রেমিকার পরম তৃপ্তি সহকারে আত্মসমর্পন, প্রেমের মধুর আসবাদে পরিতৃপ্ত নায়িকার আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। পিয়ারার মুখে প্রত্যেকটি গান সুপ্রযুক্ত ও আবেগের বিচারে যথাযথ হয়েছে। ফলে তাঁর নাটকীয় তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যর্থাথই বলেছেন – 'সুজার আসন্ন দুর্ভাগ্য পিয়ারার আনন্দ প্রেমোচ্ছল সঙ্গীতগুলির বৈপরীত্যের আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সাজাহান' নাটকের মেঘাচ্ছন্ন ঘন কৃষ্ণ আকাশে পিয়ারার গানগুলি যেন শুভ্রোজ্জ্বল সুরের বলাকা – মেঘের অন্ধকারকেই আরও নিবিড় করতে তুলেছে...।'

৮) তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে পাই কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদ উদ্যানে পণ্যা রমনীদের সঙ্গীত- 'বেলা বয়ে যায়' সাজাহানের নাটকের যে বিচিত্র সুর ও রসের গান পরিবেশিত হয়েছে, এটা সেদিক দিয়ে লক্ষণীয়। হাল্কা ভাবের গান থেকে গুরুগম্ভীর তাৎপর্যমন্ডিত গানের পসরা দিয়েও সাজাহান নাটক সজ্জিত। আলোচ্য গানটি নিতান্ত লঘু ভাবের। সোলেমানের প্রতি কাশ্মীরের নর্তকীদের প্রণয় নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গানটি যথাযথ।

৯) তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশাত্ববোধ-মূলক সংগীতটি পাই চারণ বালকদের মুখে – 'ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...'। মহামায়া চরিত্র পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার রাজপুত রমণীর তেজদৃপ্ত মহিমময় চরিত্র চিত্রিত করেছেন শুধু নয়, দেশাত্ববোধক দুটি উল্লেখযোগ্য সার্থক সংগীতও পরিবেশন করেছেন। এ ধরনের সংগীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। পৃথক গান হিসেবে আলোচ্য সংগীতটি তো সার্থক বটেই, নাটকের দিক দিয়ে বিচার করলেও তা সুপ্রযুক্ত। যশোবন্ত সিংহের বীরপত্নী মহামায়া তাঁর স্বামীর দুর্বলচিত্ততা ও দোলায়িত সংশয়ান্বিত মনোভাবের জন্য তাঁকে উদ্বোধিত করে তুলতেই আবেগময় ভাষায় বলেছেন – 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' এই ভাবাবেগ সর্বজনীন এবং

দেশপ্রেমের স্পন্দন জাগাতে এই গান সকলদেশের সকল মানুষকেই অনুপ্রাণিত করবে।

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, গান 'সাজাহান' নাটকে যতই উপযুক্ত হোক, গানের মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। তাঁরা বলেন, যদি মেনে নি' রাজপুত দেশের চারণ বালকদের গানে দেশের বন্দনা রয়েছে, তা হলে ধুম্র পাহাড় বর্ণনা মেনে নিতে পারি, কিন্তু রাজপুতানার কোথায় 'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়!' স্নিগ্ধ নদী বা হরিৎক্ষেত্র-ই বা কোথায়! আবার বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা হ'লে শেষোক্ত বর্ণনা মেনে নিলেও বাংলা দেশে পাব কোথায়?

কিন্তু এইভাবে বিশ্লেষণে গানের সামগ্রিক মহিমাকে ক্ষুদ্র করা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল যর্থাথই বলেছেন – "কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে। ইহা কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া রচিত নয়। ... এই গানকে ইংরাজিতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে, আমাদের দেশমাতাকে পরের মা বলিয়া ঘৃণা করিবে না।..." এই গানের আবেদন সর্বজনীন। তবে তো প্রশ্ন তোলা যায়, মোঘল বাদ্‌শারা বাংলা ভাষায় কথা বললেন কি ভাবে? তাঁরা সকলেই কি এতো ভালোভাবে বাংলাভাষা জানতেন বা বলতে পারতেন? এ প্রশ্ন তোলাও অবান্তর।

৩.২ সংলাপে ও ভাষায় সাজাহান নাটকের অভিনবত্ব

দ্বিজেন্দ্রলাল যে মূলতঃ কবি, নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময়েও তাঁর এই পরিচয় বারবার ধরা পড়েছে। কারণ, তাঁর ভাষা অলংকারবহুল, আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ভাষার এই সম্পদ অনেক সময়ে নাটকের ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়েছে। নিজের নাটকের ভাষা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন – 'আমার কাব্যশক্তি যাহা কিছু ছিল আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' তাঁর নাটকের ভাষা 'কবিত্বের অভাববোধ' দূর করবার ভাষা, ভাষাতে 'কাব্যশক্তি' বৃদ্ধি করবার ভাষা। তাই তাঁর নাটকে শিল্পগত ত্রুটি অনেক সময়ে ভাষাগত ওজস্বিতা ও চাতুর্যে চাঁপা পড়ে গেছে। 'চন্দ্রগুপ্তের' ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলাম, 'সাজাহানে'র ভাষা

সম্পর্কেও সে কথাই বলা চলে – 'বিশ্বপ্রেম, দেশপ্রেম, সেবাধর্ম, মানবিকতা, স্নেহপ্রেম-প্রবণতা, কর্তব্যপ্রিয়তা তথা উচ্চ আদর্শবাদ প্রচারের ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা কাব্যভাষায় পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সাফল্য তাঁর জনমন রঞ্জিত নাটকের ভাষার জন্য। তা হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত, কাব্যোপম। 'কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকার জন্য আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।" নাটকের গদ্য সংলাপের এই ভাবময় রূপ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কোন নাট্যকার কৃতিত্বের সঙ্গে সংযোজিত করতে পারেন নি। তাঁর পূর্বে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, গঠনে, নাটকীয় গুণে নাট্যকারগণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাদের নাটকের ভাষা ছিল নিছক নীরস গদ্য, যার ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের শিল্পগত বিভিন্ন আঙ্গিক (যথা – চরিত্রগত, ঘটনাগত, স্থানগত) কাব্যময় ভাষার জন্য অনেকখানি ঢাকা পড়েছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা রচনা করেছেন। বিভিন্ন নাটকের (সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপসিংহ, নূরজাহান, মেবারপতন প্রভৃতি) বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ, ঘটনা বিশেষে এই রোমান্টিক ভাবসম্বলিত কবির ভাষা প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের মনে দোলা দেয় এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমরা নাটকের বিভিন্ন ত্রুটি ভুলে ভাষার কাব্য-প্রবাহে ভেসে যাই। গদ্য সংলাপের এই বিশেষ ভাষা সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বললে মিথ্যা বলা হয় না। তাদের রচনায় ভাষা আকৃতিতে গদ্য হলেও প্রকৃতিতে নিঃসন্দেহে কবিতা।'

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাই অনেক সমালোচক তাঁর ভাষা ও সংলাপের বিষয় বারবার উল্লেখ করেছেন। কারণ নাটকে নাট্যকার অন্তরালে থাকেন। পাত্র-পাত্রীর সংলাপই নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়। নাট্যকারের কোনও কিছু বক্তব্য এই সব সংলাপের মধ্যেই প্রকাশ পায়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকগুলিতে দুধরনের সংলাপ ব্যবহার করেছেন- গদ্য সংলাপ ও কাব্য সংলাপ। নাটকীয় সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে সংশোধিত ছিলেন একথা ঠিক নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সংলাপের ভাষা সাধারণ কথোপকথনের সময়ে অসংগত মনে হয়েছে সত্য, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশের সময় আমরা এই ভাষার শক্তি উপলব্ধি করতে পারি। এই কাব্যিক ভাষার দ্বারা তিনি গদ্য সংলাপ সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গদ্যের মাধ্যমে সবরকম ভাবই প্রকাশ করা সম্ভব এবং সাধারণতঃ মানুষ গদ্যে কথাবার্তা বলে, সেইজন্য গদ্য সংলাপই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে যে গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে গদ্য নয়। তা অলংকারসমৃদ্ধ। তাই তাঁর গদ্য সংলাপের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাছাড়া একথা মনে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক নাটকের ভাষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা নয়। সে ভাষার প্রকাশভঙ্গী বর্তমান জীবন থেকে ব্যবধান রেখে চলে। তাই প্রাত্যহিক জীবনের আবেগ যে ভাষায় আমরা প্রকাশ করি, ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রী তাদের আবেগকে অনেকটা পোশাকী ভাষায় প্রকাশ করেন। তাই আবেগটি আনেক সময় খাঁটি হলেও ভাষাটি ভাষাটি কৃত্রিম বা অতিনাটকীয় বলে মনে হয়। এ ধরনের ভাষা কখনও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছে, কখনও বা তা দুর্বলতা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই কোনও কোনও সমালোচক বলেছেন, তাঁর নাটকে কাব্যধর্মের আধিক্য অনেক সময়ে নাট্যধর্মকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, নাটকের মধ্যে কাব্যধর্মের প্রকাশ অসংগত। কাব্যে কবির হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নাটকে নাট্যকারের আত্মগত ভাব প্রকাশের সুযোগ নেই। তাঁর যা কিছু বক্তব্য তা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে। রথীনবাবু যর্থাথই বলেছেন – 'নাটকের ক্ষেত্রে কবিই যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠেন, সেখানে স্বভাবতই চরিত্রগুলি কথা তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে,- সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যায় কবিকণ্ঠ। নাটকে কাব্যগুণ থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে কাব্যগুণ নাটকের শাসনকে অস্বীকার করে নিজের কারুকার্য ও অলংকারের বিলাস দেখাতে চায়, সেখানে নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে যেখানে কাব্যধর্মিতা ও নাটকীয়তা পার্বতী-পরমেশ্বর একাত্মতায় অবিচ্ছেদ্য, সেখানে কাব্যধর্মিতা নাটকীয়তাকে সমৃদ্ধই করে। শেক্সপীয়রের নাটক এর চরম উদাহরণ।– কাব্যের মাধ্যমেই সেখানে নাটকীয়তা অসাধারণত্ব লাভ করেছে।...

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগমন্ডিত ও অলংকারবহুল। উপমা-উৎপেক্ষা প্রভৃতি দিয়ে তিনি তাঁর ভাষাকে যেমন চিত্রধর্মী করে তুলেছেন, তেমনি ক্লাইম্যাক্স – আন্টিক্লাইম্যক্সের দ্রুত-সঞ্চারী আন্দোলনে তাঁর ভাষা হয়েছে গতিবেগমুখর। চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেও তাঁর ভাষা হালকা নয়, প্রকৃতিধর্মের দিক থেকে এ ভাষা সাধুভাষার প্রকারভেদ মাত্র। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, সমাসবহুলতা ও গাম্ভীর্য এ ভাষাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যে কাব্যধর্মিতার সঙ্গে ওজস্বিতা গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর নাটকের মঞ্চসাফল্যের অন্যতম কারণ, এই ঐশ্বর্যশালী দৃপ্ত ভাষা। তাঁর নাট্যসংলাপ তীব্র অন্তর্দাহ, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ ও মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা। তাই চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন ফুটিয়ে তুলতে এই ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। শব্দ-সংস্থানের কৌশল, পদবিন্যাসের রীতি ও আলংকারিক কারুকার্য নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এক সাংগীতিক মূর্ছনার সৃষ্টি করেছে।... দ্বিজেন্দ্রলাল যেন ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেছেন এ কাব্য নয় নাটক। তাছাড়া এই বিশিষ্ট রীতিটি ভিন্ন আর কোনও ভঙ্গী তাঁর সংলাপে রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু একই ভঙ্গী যত্রতত্র প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত মুদ্রাদোষে পরিণত হয়, তাছাড়া কাটা কাটা ইংরেজি ঘেঁষা সংলাপ অনেক সময় শ্রুতিকটূ হয়েছে... এই জাতীয় অসমাপ্ত কাটাকাটা বাক্যাংশের অতিরিক্ত প্রয়োগ অনেকসময় সংলাপকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্মী অলংকারবহুল সংলাপের মধ্যে এটি হল একটি প্রধান ত্রুটি।'

গদ্যে এই সংলাপ রচনার কৃতিত্ব বাংলাসাহিত্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এই উক্তিগুলি স্থানকালের পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত। এই ধরনের ভাষা প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যা-বুদ্ধি-বয়স-জ্ঞান বা মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ভাষা-প্রকাশের যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় সে বিভিন্নতা নজরে পরে না। তাই দেখি বৃদ্ধ সাজাহান বা কূটকৌশলী ঔরংজীব বা জাহানারা যে ভাষায় কথা বলেছেন, বালক সিপার বা বালিকা জহরতের ভাষাও সেই ধরনের। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের এই

ধরনের চিত্রধর্মী ও সঙ্গীতমুখর ভাষা আমাদের সময় সময় যেমন আকৃষ্ট করে, আবার তাঁর আতিশয্য বা অপপ্রয়োগেও আমাদের তা শ্রুতিকটূ লাগে। দ্বিজেন্দ্র-গবেষক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'সমাসোক্তি অলংকারের দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্যকে সজীব করে তুলেছেন Oxymoron Epigram জাতীয় বিরোধমূলক অলংকার সৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার মধ্যেও দৃঢ়তার অভাব নেই। যুক্তাক্ষর বাহুল্য বা সমাসবদ্ধতা তাঁর বাঁধুনিকে একটা গাঢ় সংযত রূপ দিয়েছে' ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা যতই কাব্যমন্ডিত হোক না কেন, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে এই ভাষা। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক সমন্বয় নাটকগুলিতে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না বটে, 'সাজাহান নাটক সেদিক দিয়ে অনেকটা পরিমানে সার্থক। সংলাপের মধ্যে অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাস যে নেই তা নয়, তবে অলংকারমন্ডিত এই ভাষা স্থানে স্থানে অতিনাটকীয় হলেও অনেক ক্ষেত্রেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই চিত্রধর্মী গীতিধর্মী ভাষা যেমন তাঁর নাটককে জনপ্রিয় করেছে, অন্যদিকে তাঁর নাট্যধর্মকে ক্ষুন্ন করেছে সেই কাব্যের মহিমা। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকের কাব্যমন্ডিত সংলাপ যে একই ধরনের সেটি লক্ষ্য করলেই নজরে পড়ে।

যেমন – ১) ঔরংজীবের সংলাপ – "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ঝড় উঠবে! একটা নদী পার হয়েছি; এ আর এক নদী, ভীষণ পল্লবিত তরঙ্গসংকুল। এত প্রশস্ত যে তাঁর ওপার দেখতে পাচ্ছি না,তবু পার হতে হবে এই নৌকা নিয়ে।"

অথবা – জাহানারার উক্তি – "বাব, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মতো ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পশুর মতো বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ক'রে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমুর্ষুর মতো অন্তিমে একবার ঈশ্বর দয়াময় বলে ডাকলে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভূজঙ্গের মতো ফণা বিস্তার করে হিতশাবক ব্যাঘ্রীর মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মতো কঠিন হউন; হিংসার মতো অন্ধ হউন; শয়তানের ক্রুর হউন। তবে তার সঙ্গে পারবেন।"

অথবা,

৩) সাজাহানের উক্তির – "উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ' আমি অগ্নির মতো জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মতো ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মতো সাম্রাজ্য খানি ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যায়, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের তাকে এসে গ্রাস কর। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে! আয় তো; এইবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যায় – তারপর কোথায় যায় - কিছুই যায় আসে না। ধূপের মতো একটা জ্বালায় উর্ধেব উঠে বিরাট হাহকারে শূণ্যে ছড়িয়ে পড়ি।"

সাজাহান ও ঔরংজীবের সংলাপ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চড়া সুরে বাঁধা।

৪) পিয়ারা সংলাপ – 'কি হবে সাম্রাজ্যের নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখো শস্যশ্যামলা পুষ্পভূষিতা, সহস্র নির্ঝর ঝঙ্কিত অমরাবতী – এই বংভূমি। কীসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিজ্ঘাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তাঁর কাছে কীসের সেই ময়ূর সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে – করে কর - বক্ষে বক্ষ- বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের ওপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায় – সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তাঁর মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি। - তখন মনে হয় না-নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয়তো যা আমাদেরনাই তা পাব না; যা আছে তা হারাবো।' কিংম্বা – কাশ্মীরি নর্তকীদের সোলেমানের উক্তি, মহামায়ার তেজ দীপ্ত ভাষণ – তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে আবেগের ঐ একই চড়া পর্দায় বাঁধা। আবার জহরতের মতো বালিকার কণ্ঠেও সেই ধরনেরই ভাষা লক্ষ্য করে থাকি।

সংলাপ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য – 'স্বগতোক্তি বর্জন। তিনি বলেছিলেন – 'আমি এই নাটকে 'নূরজাহান' দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি। একজনের এইরূপ চিৎকার করিয়া স্বগতোক্তি জা সমস্ত শ্রোতৃগণ শুনিতে পাইতেছেন কেবল পার্শ্বে দন্ডায়মান ব্যক্তি ঘটনাটিকে শুনিতে পাইতেন না। এ অনিবার্য ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্যকর ঠেকে।" সে

জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে অন্যভাবে স্বগতোক্তি প্রকাশ করেছেন। অন্যের উপস্থিতিতে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল কোনোও চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে তাঁকে একাকী মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। একাকী মঞ্চে উপস্থিত থেকে আপন মনে কথা বলায় দর্শকরা চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারলেন, অথচ তা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হল না। যেমন আমরা দেখেছি 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান, ঔরংজীব, দিলদার বা সোলেমান, জয়সিংহের একক ভাষণের মধ্যে। এর দ্বারা স্বগতোক্তির উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। যে Shakespeare এর নাটকাবলী দ্বিজেন্দ্রলাল বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, যে Shakespeare এর স্বগতোক্তি বিশ্বসাহিত্যে বেশ মর্যাদার সঙ্গে স্মরণীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল Shakespeare এর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের নাটকে এই নতুন পদ্ধতিটি সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ স্বগতোক্তিকে বর্জন করে একক ভাষণ জাতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর আগমন নির্গমনের ফাঁকে ফাঁকে এই সব একক ভাষণ প্রকাশ পেয়েছে বলে কোনও ক্ষেত্রে তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। বরং নাটকের সঙ্গে সংগতি রেখেই তা ঘটনাবলী ও চরিত্রগুলিকে প্রকাশ করেছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী নাট্যকারেরা স্বগতোক্তি বর্জনের কথা ভাবতেই পারেননি। মধুসূদনের মত নাট্যকার তাঁর নাটকে এত বেশী স্বগতোক্তি দিয়েছেন যা তাঁর নাটকীয় তাৎপর্যে মন্ডিত। ঔরংজীবের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাঁর কূটনৈতিক চালচলন, তাঁর মানসিকতা সমস্তই দর্শকের সামনে ধরা পড়েছে কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর একক ভাষণে, যা অন্যের উপস্থিতিতে স্বগতোক্তি ভাষণের দ্বারা প্রকাশ পেলে অস্বাভাবিক বলে মনে হত।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস। 'হাসির গান' এর রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন রচনাতে যেটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন, গুরুগম্ভীর নাটক রচনায় সেই দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা খুঁজে পাই না। সাহিত্যে হাস্যরসের যে নানা শ্রেণি-বিভাগ আছে (Wit, Humour, Satire, Irony, Sarcasm), তার যে কোনোও একটি ধারার সার্থক প্রকাশ আমরা 'সাজাহান' নাটকে লক্ষ্য করি না। 'সাজাহান' নাটকে তিনি

দিলদার ও পিয়ারার মাধ্যমে যেটুকু হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, তা নিতান্তই Dramatic relief সৃষ্টির জন্য লঘু পরিবেশ সৃষ্টি করা। ফলে এসব ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস নাটকের সঙ্গে একীভূত হয়ে শিল্পমন্ডিত হয়ে ওঠেনি। তাঁর হাস্যরস নিতান্তই সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ভাঁড়ামি গোত্রীয়। ফলে 'সাজাহান' জাতীয় হাস্যরস সৃজনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যর্থ।

দিলদার ও পিয়ারার মধ্যেও আস্বাদের পার্থক্য রয়েছে। দিলদারের হাস্যরস ব্যঙ্গনিপুণ অর্থবহ। নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে দিলদার লঘু আচরণ করেননি। দিলদার শ্রেণির চরিত্রকে দিয়ে যর্থাথ হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় না। দিলদারের আচরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিজে বোকা সেজে মোরাদের নির্বুদ্ধিতাকে দিলদার যেভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, মোরাদকে সচেতন করে দেওয়ার জন্য তাঁর যে প্রয়াস তা ঔরংজীবের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই লঘু সংলাপের দ্বারা দিলদার যতই রসিকতা করুন না কেন, তা নির্মল হাস্যরস হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম সাক্ষাতে দিলদার নিজের পরিচয় দিয়েছেন –"আমি মুখে মোরাদের বিদূষক, আমি হাস্য পরিহাসা করতে যাই – সে ব্যঙ্গের ধুম হয়েচ ওঠে। মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে হাসে।" এবং তাঁর শেষ আত্মপ্রকাশে দিলদার সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছেন। সুতরাং দিলদারের যা কিছু সংলাপ তা যতই হালকা বলে মনে হোক, তা যর্থাথ অতখানি নির্মল নয়। এ প্রসঙ্গে মোরাদের সঙ্গে তাঁর নানাধরনের ব্যঙ্গ নিপুণ সংলাপের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

সেদিক দিয়ে বরং পিয়ারা-চরিত্রটি এই শ্বাসরুদ্ধকারী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের গুরুগম্ভীর পরিবেশে একটুখানি অবকাশ নেবার মাধ্যম। প্রেমময়ী পিয়ারা সংগীতে কৌতুকে সুজার জীবনকে ভরিয়ে রেখেছেন। পিয়ারার হাস্যপরিহাস নিতান্তই হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। ফলে হাস্যের এই সঞ্জীবতা পিয়ারাকে যেমন দুঃখ জয়ের শক্তি দিয়েছে, তেমনি দর্শকও প্রসন্ন চিত্তে পিয়ারার লঘু পরিহাসকে উপভোগ করেছে। পিয়ারার সংলাপে দর্শকচিত্ত হাস্যের উচ্চকিত হয়ে ওঠে না, স্মিত হাস্যের প্রসন্নতায় দর্শক সত্যকার Dramatic relief বোধ করেন। সুজার সঙ্গে পিয়ারা কথাবার্তার মধ্যে এই লঘু পরিবেশ সমগ্র নাটকের মধ্যে একমাত্র আলোক প্রবেশের

গবাক্ষ। কিন্তু সেই পিয়ারাকেও শেষ পর্যন্ত ঘটনার আবর্তে নিজ মর্যাদা রক্ষায় রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। এবং হাস্যরসের শুভ্রতা তেজদৃপ্ত ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পিয়ারা-চরিত্রকে মহিমমন্ডিত করেছে।

এই দুটি চরিত্র ছাড়া সমগ্র নাটকের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব , তার ছলনা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা মানবিক অনুভূতির ওপর পীড়ন পরিমন্ডলকে ট্র্যাজিডির বেদনার দ্বারা আচ্ছন্ন করেছে যতখানি, সে পরিমাণে **Dramatic relief** দিতে পারেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে সংগীতের উপস্থাপনা ও পূর্বোক্ত এই দুটি চরিত্রের আচার-আচরণ আমাদের এই গুমোট আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে।

৩.৩ ট্র্যাজেডি হিসাবে সার্থকতা

ট্র্যাজেডি বিচারঃ – পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্র্যাজেডি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচ্য সাহিত্য-ধারায় ট্র্যাজেডির জন্ম উনিশ শতকে। কারণ প্রাচ্য জীবনাদর্শে ও বিশ্বাসে জন্মান্তরবাদ সত্য বলে স্বীকৃত। তাই এক জীবনের বিচ্ছেদকে তাঁরা কখনই চরম বলে স্বীকার করে নেয় নি। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনাদর্শে বর্তমান জীবনই চরম সত্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে বর্তমান জীবনের বিচ্ছেদ-বেদনাকে তারা সত্য বলে স্বীকার করেছে। সাহিত্যে সেই সত্য ও বিশ্বাসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে ট্র্যাজেডির নানা প্রকার ভেদ ও প্রকাশের বিভিন্নতা লক্ষণীয়। যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির মিল লক্ষ করা গেছে প্রবল ভাবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ নিয়ে একটি ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটল যে ভাবে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সেই রীতির অনুসারে আধুনিককালের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। সুতরাং যুগে যুগে জীবন ও জগতের পরিবর্তন এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ট্র্যাজেডির সংজ্ঞকেও পরিবর্তিত করেছ। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তি মানব-চরিত্রের নিয়ন্তারূপে নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে মানুষই মানুষের বিপর্যয়ের কারণ রূপে প্রকাশিত। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে কোন অদৃশ্য শক্তি থাকে যাকে নিয়তি বা FATE

বলে। মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর পরিণতির জন্য সেই অদৃশ্য শক্তিই দায়ী। অন্যদিকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখি, মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বা ভুলভ্রান্তি তাঁর জীবনকে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন মানুষের নিজস্ব চরিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর পতনের বীজ আত্মগোপন করে আছে। মানুষের নিজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতার জন্য তাঁর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নায়ক চরিত্রকে কেন্দ্র করেই সাধারণত শেক্সপীয়ার ট্র্যাজেডির রূপ অঙ্কিত করেছেন।

গ্রীক বা অ্যারিস্টটল বা শেক্সপীরীয় যে ট্র্যাজেডিই অঙ্কিত হোক না কেন, পাত্র বা পাত্রীর কিছু মৃত্যু দৃশ্য সেখানে চিত্রিত হবেই। কিন্তু আধুনিক কালের ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু-ঘটানো ট্র্যাজেডির পক্ষে অপরিহার্য নয়। আমরা জানি ট্র্যাজেডি রচনা ব্যর্থ হলে অনেক সময়ে নাটক মেলোড্রামা হয়ে ওঠে। অনেক পণ্ডিত আবার করুণ রসের আতিশয্য ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অন্তরায় বলে মনে করেন। অর্থাৎ করুণরসাত্মক বা Pathetic ঘটনার সমাবেশ বেশি থাকলে তাতে সার্থক ট্র্যাজেডি হয় না। কিন্তু এই মত সর্বজন গ্রাহ্য নয়। এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দেশ্য Pity এবং Fear জাগ্রত করা। কিন্তু নিকোলের মতে Emotion of Awe অর্থাৎ বিস্ময় বিমূঢ়তার আবেগকে জাগানোই ট্র্যাজেডির লক্ষণ। Pathetic দৃশ্য শুধু থাকলেই চলবে না, তা যুগপৎ Pity বা Fear জাগ্রত করবে। কিন্তু এ কথা সকলেরি জানা, এমন অনেক নাটক আছে যেখানে করুণ রসের প্রাচুর্য থাকলেও তা ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অন্তরায় হয় নি।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি হবেন সৎ এবং তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে বিশেষ নৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। জনৈক সমালোচকের মতে 'নায়ক সাধারণ স্তরের মানুষ নহেন। ... সৌভাগ্যের শিখর-দেশ হইতে তাহার পতন কোন চেষ্টাকৃত অসৎ বৃত্তির জন্য সংগঠিত হয় না। ইহা তাহার চরিত্রের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে... তাহা কিছুটা নায়কের স্বেচ্ছাকৃত, আবার কিছুটা অনিচ্ছাকৃত-... সুতরাং এই যে ত্রুটি তাহার সহিত পাপের কোন সংযোগ নাই। ইহা নায়কের বিচারের, ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু

ত্রুটি। যে চরিত্র সৎ অথচ যাঁহার মধ্যে মৃত্তিকার স্পর্শ আছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তিনি ট্র্যাজেডির নায়ক-মহিমা লাভ করিবার পক্ষে উপযুক্ত।'

শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিতে নায়কের চরিত্রে যে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা, সেই দুর্বলতার পথ ধরেই সে পতনের মুখে এগিয়ে যায় এবং পরিণতিতে চরিত্রটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ট্রাজিক চরিত্রের প্রধান লক্ষণ- Radical Defect in his Character (the flaw arising from circumstances) অথবা Error of judgement নায়ক চরিত্রের এই প্রচ্ছন্ন দুর্বলতার পথ দিয়েই তাঁর জীবনে শনি প্রবেশ করে এবং তাঁর বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু নায়ক তাঁর ব্যক্তি সত্তার শক্তি নিয়ে এই পতন বা বিপর্যয়ের মুখে রুখে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই ভাবে আত্মরক্ষার সংগ্রামে লাঞ্ছিত হতে হতে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে নায়ক হারিয়ে যায়। এই পতনের মধ্যেও সে গৌরবের মহিমা লাভ করে। জনৈক সমালোচক বলেছেন – " মানুষ ইহাতে মানুষের আত্মরক্ষার শক্তি যে কত গভীর, তাহা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া যায়। তাহার শক্তি এবং ঐশ্বর্য তাহার অন্তিম পরাজয়ের অবমাননার মধ্যেও তাহাকে গৌরবের টীকা পরাইয়া দিয়া যায়।" আবার আমরা এও লক্ষ করেছি, মানুষের যেমন বিপর্যয়ের বা ট্র্যাজেডির কারণ, তেমনই ট্রাজিক চরিত্রের নিজের মধ্যেই দুই বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্ব একে অপরকে বিপর্যস্ত করে। ফলে এই দ্বন্দ্বময় কারণেই ক্ষতবিক্ষত ট্রাজিক চরিত্রটি নিজেই নিজের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ট্র্যাজেডির স্বরূপ এবং ট্রাজিক নায়ক সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য – "ট্রাজিক রস বলে আজকে নতুন যে রসের কথা শুনি তার স্থায়ী ভাব কি এবং তার বিভাব ও অনুভাবের স্বরূপ কি, সে বিষয়ে ঠিক ধারণা কোন অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে পাই না। আজ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির ঠিক বাংলা নাম পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয় নি। ট্র্যাজেডি বিচারের কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড আজও করা সম্ভব হয় নি..."

এইবার আমরা 'সাজাহান' নাটকে ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। 'সাজাহান' নাটক সম্পর্কে প্রায় সব সমালোচকই একমত যে 'সাজাহান' ট্র্যাজেডি।

এখন ট্র্যাজেডির প্রকাশ নিয়ে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি কার, ট্র্যাজেডি কেন এবং কি ধরনের ট্র্যাজেডি – ঘটনাগত অথবা চরিত্রগত? দ্বিজেন্দ্র-জীবনী লেখক শ্রী নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছেন – 'দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজেডি – চূড়ান্ত ঘটনা। দারার ট্র্যাজেডি দেখানোই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এ মত মেনে নিতে পারি না। কারণ, যার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ওপর নাটকের মূল ঘটনাবর্ত গ্রথিত, তিনি দারা নন, সাজাহান। দারার বিপর্যয় নাটকের নানা বিপর্যয়ের অন্যতম; সাজাহানের শেষ জীবনের বহু রকমের বিপর্যয়ের মধ্যে একটি, একটি বড় রকমের আঘাত। তাই বলে দারার মৃত্যুটাই সাজাহানের চূড়ান্ত ঘটনা হতে পারে না। ভাগ্যবিপর্যয় আসলে সাজাহানের; বৃদ্ধ সাজাহানের শেষ জীবনের চরমতম আঘাত। দারার মৃত্যু ঘটেছে চতুর্থ অঙ্কে। ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার দিক দিয়ে শেষ অঙ্কেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। দারার মৃত্যুতে স্নেহপ্রবণ সাজাহান অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। দারাই ট্র্যাজেডির লক্ষ্য হলে সাজাহানের এই চিত্তবিকার নাট্যকার দেখাতেন না। পঞ্চম অঙ্কে সাজাহানের অন্তর্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার পরিণতি সাজাহান চরিত্রকে ট্রাজিক মহিমা দিয়েছে। এই অন্তর্দাহের তীব্রতা দারা চরিত্রে নেই, তার মৃত্যু যতই শোকাবহ হোক না কেন।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন – "ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা খুব আছে বলিয়া মনে হয় না। সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা।... নাটকটির নাম জাহানারা হইলেই বোধহয় ঠিক হইত।" ডঃ সেন তাঁর নিজের বক্তব্য সম্পর্কে বোধ করি খুব সচেতন নন। কারণ কোনও চরিত্র ব্যক্তিত্বে ও আত্মপ্রকাশে বলিষ্ঠ হলেই কাহিনীতে প্রাধান্য পাবে ও নামকরণে সেই প্রভাব মুদ্রিত থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। জাহানারা চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু তাঁকে ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র বলার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। কারণ তাঁর 'Doing' এবং 'Suffering' ঘিরে নাটকটি রচিত নয়। তাছাড়া জাহানারা যতই 'স্ফুট' এবং 'বলিষ্ঠ' চরিত্র হোন না কেন, ট্র্যাজেডি সৃষ্টির জন্য তিনি কোনও ঘটনার সৃষ্টি ও করেননি, তার

ফলভোগও করেননি। ট্র্যাজেডির পক্ষতাড়নে জাহানারা আঘাত পেয়েছেন সত্য, কিন্তু আহতের আর্তনাদে ও বিপর্যয়ে সমগ্র কাহিনি মথিত হয়ে ওঠেনি।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন – "প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করিতেছেন তিনি ঔরংজীব। ঔরংজীবের কুটিল নিষ্ঠুর চক্রান্ত...অন্যান্য চরিত্রগুলোকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার যেন নিরুদ্ধ হাহাকারে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে।" ডঃ ঘোষ স্বীকার করেছেন, জনপ্রিয়তার বিচারে এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে গুণগত বিচারেও 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাছাড়া 'ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া সেই কাহিনী এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন নাটকীয় রসের মধ্যে জমাইয়া" তুলে 'সাজাহান' নাটককে দ্বিজেন্দ্রলাল রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন।' ডঃ ঘোষের মতে ঔরংজীব চরিত্রটি সবচেয়ে সক্রিয়, একথা আমরা মেনে নিতে পারি। এটাও স্বীকার করি, নাটকে এতগুলি চরিত্রের বিপর্যয়ের জন্য ঔরংজীব দায়ী। তিনি যে দ্বন্দ্বহীনতা, হৃদয়হীন পিশাচ নন, তাও স্বীকার করি। তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে সার্থক ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে যতখানি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও বিবেকের দংশন দেখানো উচিৎ, তা এখানে প্রকাশ পায়নি। তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত ঔরংজীব চরিত্রে তাঁর কূটকৌশল ও দ্বন্দ্ব যেটুকু আভাস পাই, তা কোনোক্রমেই বিবেকের দংশন বলা চলে না।

মোরাদ, জাহানারা, যশোবন্ত সিংহ, মহম্মদ সকলের প্রতি ব্যবহারে কূটকৌশলী ঔরংজীবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেবার পর এবং দিলদারের স্পষ্ট সমালোচনায় ঔরংজীব - চিত্তে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। ঔরংজীবের দ্বন্দ্ব নাট্যকার ঔরংজীব উক্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন। ফলে ঔরংজীবের কূটকৌশল ও চক্রান্তের মধ্যেও নাট্যকার তাঁর বিবেকের দংশন দেখিয়েছেন এবং নাটকের শেষে ঔরংজীবের অনুতাপ দগ্ধ মানসিকতার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সুতরাং ঔরংজীব চরিত্রে যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, পূর্বাপর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে এবং পরিণতি লক্ষ্য করলে তাঁকে কোনোভাবেই ট্রাজিক চরিত্রের বা ট্র্যাজেডির নায়কের মহিমা আরোপ করা যায় না।

এবার সাজাহান চরিত্রের সম্পর্কে ট্র্যাজেডির সম্পর্কে বিচার করে দেখা যেতে পারে। সাজাহান চরিত্র সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি নাটকের আদর্শ যে শেক্সপীয়ারের একথা মনে রাখা উচিৎ। সাজাহানের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে King Lear এর আচরণের তুলনা করা যেতে পারে। Bradley বলেছেন - When the conclusion arrives, the old king has for a long while been passive. We have long regarded him not only as a man more sinned against than sinning, but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent. তাই দেখা যায়, Hamlet, Macbeth, Othello ধরনের চরিত্রে "Fatal weakness error, wrong doing, continues almost to the end' কিন্তু Lear চরিত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। Lear –কে দেখে মনে হয় তাঁর দুঃখভোগের আঘাতের পর আঘাতের যেন তিনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। তাই King Lear **এর মত সাজাহানকেও বলা যায়** Tragedy of suffering

আর একদল সমালোচক বলেন, ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থাকে, নানা গুণাবলী সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও সেই দুর্বলতার ছিন্নপত্র ধরে তাঁর জীবনে শনি প্রবেশ করে তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তোলে। এর উত্তরে বলা যায়, বৃদ্ধ সাজাহান হয়তো বাইরের দিক দিয়ে ততখানি সক্রিয় নন। কিন্তু তা বলে তাঁর চরিত্রে দ্বন্দ্বের অভাব ঘটেনি। তাঁর স্নেহ ও আতিশয্যের দুর্বলতা পথ ধরে সাজাহানের জীবনে ট্র্যাজেডি ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, দুঃখভোগের চিত্র বর্ণনাই ট্র্যাজেডি নয়। সেই সঙ্গে জড়িত থাকা চাই খানিকটা বহিরঙ্গিক কারণ। পিতা সাজাহান স্নেহ ও আতিশয্যের জন্য ঔরংজীবের অন্যায় সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর হতে গিয়েও কঠোর হতে পারেন নি। আর সেই দুর্বলতার পথ ধরেই তাঁর জীবনে ট্রাজিক পরিণতি। Bradley র কথায় বলা চলে – "No mere suffering or misfortune, no suffering that does not spring in great part from human agency, and in some degree from the agency of sufferer is tragic, however pitiful or dreadful it may be." সাজাহান চরিত্রের যে দ্বন্দ্বের কথা আগে বলেছি,

তাতে আমরা লক্ষ্য করি পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব। অন্যায়কারী পুত্রের প্রতি স্নেহ ও মমতার জন্য সাজাহান নিজেই স্বীকার করেছেন বিপর্যয়ের জন্য কম দায়ী নন। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় যথার্থই বলেছেন, - "আগ্রার দুর্গ পতনের জন্য Human agency ঔরংজীব যেমন দায়ী, তেমনি agency of the sufferer অর্থাৎ সাজাহানের দায়িত্বও কম নয়" সাজাহান নিজেই স্বীকার করেছেন – "সব দোষ আমার। আমি স্নেহাবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিলো সব দিয়েছিলাম"... তাঁর অপরিমেয় স্নেহই বুদ্ধিভ্রংশের কারণ হয়েছে।" তাই ঔরংজীবের মতো অতখানি কর্মচাঞ্চল্য না হলেও সাজাহানকে নিষ্ক্রিয় বলা চলে না, বহিরনফিক কার্যকলাপের মতন দ্বন্দ্বের বাতাবরণের ভিতর দিয়ে তাঁর মানসিক সংযোগ ছিল লক্ষ্য করার মতো। ঔরংজীবের সক্রিয়তা বাইরের জগতে যতখানি, মনোজগতে ততখানি নয় বটে, কিন্তু তবুও মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিচারে ঔরংজীবকে নিষ্ক্রিয় বলা চলে না। ঠিক তেমনি সাজাহান মনোজগতে যতখানি সক্রিয়, বাইরের কর্মজগতে বন্দী থাকার জন্যই হোক, বাধর্ক্যের জন্য শারীরিক অপটুত্বের জন্যই হোক, বাইরের জগতে তাই ততখানি কর্মচঞ্চল নন। তা বলে কি তাকে নিষ্ক্রিয় বলা চলে? মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে দেহের অসহায় নিষ্ক্রিয়তার প্রবল বিরোধ, সাজাহানকে সক্রিয় করে তোলার অন্যতম কারণ। সাজাহান বলেছেন – "আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী – নারীর মত অসহায়, শিশুর মতো দুর্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন –একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই।"

কেউ কেউ বলেন, নাটকের শেষে সাজাহানের মৃত্যু ঘটেনি; বরং ক্ষমাপ্রার্থী পুত্র ঔরংজীবকে ক্ষমা করে সাজাহান নাটকের একমাত্র পরিণতি হতে পারে না। তাই শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে আমরা নায়কের মৃত্যু দেখেছি বটে, কিন্তু আধুনিককালে মৃত্যু না ঘটিয়েও সার্থক ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। বেঁচে থেকে ট্র্যাজেডির বেদনা আরও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

সাজাহানের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্র-গবেষক রথীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য – "সাজাহান নাটকে সাজাহানের মৃত্যু হয়নি, এমনকি স্পষ্টতঃ কোনো বিপত্তিজনক সমাধান হয়নি। কিন্তু তাঁর জন্য সাজাহান চরিত্রের ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনা ক্ষুন্ন হয়নি। সাজাহানের ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর বিভক্ত সত্তার নিম্নলিখিত পর্যায় লক্ষ্য করা জায়ঃ- ১। সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্ব, ২। সাজাহানের বন্দীদশা ও ঔরংজীব সম্রাট নাম গ্রহণ করার পর সম্রাট সাজাহানের বিলুপ্তি, ৩। পিতা সাজাহানের মধ্যে এবার দুটি সত্তা প্রকাশিত হলোঃ দারা, সুজা ও মোরাদের পিতা এবং তাদের হত্যাকারী ঔরংজীবের পিতা। ঔরংজীব যেমন তাঁর তিনি পুত্রের হত্যাকারী, তেমনিতিনি সাজাহানের একমাত্র জীবিত পুত্র। একদিকে দারা, সুজা ও মোরাদের পিতা সাজাহান পুত্র বিয়োগের বেদনায় অধীর, উন্মাদ, অন্যদিকে সেই পুত্রঘাতী পুত্র ঔরংজীবের প্রতি তাঁর পিতৃহৃদয়ের অপার মমতা। বাৎসল্য বৃত্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ সৃষ্টি করে নাট্যকার সাজাহানের বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী চিত্র এঁকেছেন।"

"শেষ দৃশ্যে ঔরংজীবকে মার্জনা করার সময় সাজাহানের এই বাৎসল্যবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষনীয়ঃ 'না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে – এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণীমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জনা! ঔরংজীব... ঔরংজীব! না, সে সব মনে করব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।' – সাজাহানের এই উক্তি নাটকের মৃত্যু-পরিণাম বা বিপত্তি সমাধান থেকে অনেক বেশী মর্মান্তিক। শুধু মর্মান্তিক বা শোকাবহ বললে যথেষ্ঠ বলা হবে না, এই মিতাক্ষর মন্তব্যের পিছনে আছে সাজাহানের বিভক্ত আত্মার অপচয়ের বেদনা। উক্তিটির আরম্ভ হয়েছে আত্মগতভাবে – অদূরবর্তী জীবনসন্ধ্যার দিকে চেয়ে পিতার মৃত্যুবরণের নীরব প্রস্তুতি – পুত্রকে সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই মৃত পুত্রদের কথা তাঁর মনে হয়েছে – কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে জ্বালা। এই জ্বালা নিয়েই শেষ পর্যন্ত তিনি ঔরংজীবের সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন। ঔরংজীবকে মার্জনা করার

ঘটনা সাধারণ ঘটনামাত্র নয়। এ পরিণতির বাইরে মিলনের প্রলেপ থাকলেও আসলে ঐ উক্তির মধ্যে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির।"

সুতরাং নাটকটি আগাগোড়া বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টই অনুধাবন করতে পারি, সাজাহানের মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে, সাজাহানের ট্রাজেডিই তা প্রমাণ করেছে। তাই দারার মৃত্যু নাটকের পরিণতি নয়, সাজাহানের ট্রাজেডিই তা প্রমাণ করেছে। তাই দারার মৃত্যু নাটকের পরিণতি নয়, সাজাহানের ট্র্যাজেডিই তাকে গাঢ়তর করে তুলেছে। সাজাহান নাটকের ট্র্যাজেডিই দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ট্র্যাজেডির নায়কের বিরাটত্ব ও মহনীয়তা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তাঁর পতনে ও বিপর্যয়ে আমরা বিস্ময়ে ভয়চকিত বিহ্বলতায় অভিভূত হয়ে পড়ি। ঔরংজীবের চরিত্র যেমন আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। অন্যদিকে তেমনি তাঁর চরিত্র বিপর্যয়ে আমরা তেমন ভাবে প্রভাবিতও হই না। কিন্তু সাজাহান শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে তাঁর নিজস্ব দুর্বলতা ও স্খলনের জন্য বিপর্যস্ত হন, সহানুভূতিও আকর্ষণ করেন। সাজাহানের এই বিপর্যয় তাঁর চরিত্রের মহিমা ও গৌরবকে কোনোভাবেই ম্লান করে না। ট্র্যাজেডির নায়ক কোনো অবস্থাতেই ক্ষুদ্রচেতা বা হীন হবেন না। তাঁর পতনে হৃদয় বিদীর্ণ হবে, কিন্তু তবুও এই বিপর্যয়ে তাঁর চরিত্রের মহত্ব কোনো অংশেই খর্ব করবে না। তাই 'সাজাহান' নাটক শুধু সার্থক ট্র্যাজেডিই নয়, সাজাহান চরিত্রটিও ট্র্যাজিক নায়কের উপযোগী এবং ট্র্যাজেডির সমস্ত লক্ষণই এই নাটকটিতে চরিত্রটিতে বিধৃত।

৩.৪ দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব

একথা সুবিদিত যে, আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে; যদিও সংস্কৃত নাটক ও দেশীয় যাত্রার প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সংস্কৃত নাটককে অঙ্ক থাকলেও দৃশ্যাবলীর বিস্তীর্ণ শ্রেণিবিভাগ ছিল না, ট্র্যাজেডির স্থানও ছিল না – এ সবই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাট্যকারেরা নিছক বহিরঙ্গ আঙ্গিক কৌশলে অক্ষম অনুকরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই অনুকরণকে স্থিরকরণের

মধ্যে দিয়ে নিজস্ব করে প্রকাশ করেছিলেন মধুসূদন। তাই মধুসূদনে দেখি পাশ্চাত্য নাট্যরীতি সম্পর্কে আঙ্গিকের বহিরঙ্গ কলাকৌশল ও অন্তরঙ্গ সম্পদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও জ্ঞান। মধুসূদন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা নাট্যসাধনা দ্রুতগামিতার সঙ্গে সার্থকতার পথে এগিয়ে গেছে, এই যাত্রাপথের শুরুতে নাটক ছিল ধনী বিলাসীদের প্রমোদ উপকরণ। কিন্তু জাতীয় নাট্য আন্দোলনের পথে তা শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের এক্তিয়ারভুক্ত সার্থকতার পথে এগিয়ে গেল।

তৎকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য নাট্য আঙ্গিক সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিলেন। শেক্সপীরীয় নাটকের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ক্রমে তাঁর নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আমাদের আলোচ্য নাটক 'সাজাহান' সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শেক্সপীয়ারের 'কিং লিয়ার' নাটকের সঙ্গে "সাজাহান" নাটকের বিশেষত দুটি চরিত্রের সাদৃশ্য সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। শ্রী নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেন – '...সাজাহানের ইতিবৃত্তের সহিত লিয়ারের কাহিনির একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই রাজা, জরাগ্রস্ত, রাজ্যভ্রষ্ট এবং সন্তাঙ্গণের নিষ্ঠুর আচরণে মর্মাহত। সাজাহানকেও নাট্যকার লিয়ারের অবস্থায় ফেলিয়াছেন এবং সাজাহানের হৃদয়ও লিয়ারের মতো, কোমল ও সহজে বিশ্বাসপ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।...'

এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন – '...সাজাহানের সম্রাটসত্তার পরিচয় প্রথমাংকে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। দারাকে তিনি বলেছেনঃ- তাঁরা জানুক যে, সাজাহান শুধু পিতা নয়, সাজাহান সম্রাট।' কিন্তু সাজাহানের সম্রাট সত্তা লিয়ারের মতো এতো প্রবল নয়। এইখানেই লিয়ারের ট্র্যাজেডির সমহে সাজাহানের ট্র্যাজেডির মৌলিক পার্থক্য।

কিং লিয়ার চরিত্রের সঙ্গে সাজাহান চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্র-গবেষক বলেছেন –"...সাজাহানের রাজকীয় কর্তব্যবোধ একটি প্রাসঙ্গিক ও গৌণ উপকরণমাত্র। লিয়ারের ট্র্যাজেডির প্রাথমিক কারণ হল রাজকীয় কর্তব্য থেকে তাঁর বিচ্যুতি। অসংযত আবেগের বশবর্তী হয়ে লিয়ার তাঁর প্রিয়তমা কডেলিয়ার উপর চূড়ান্ত অবিচার করেছেন।... সাজাহানের ভুল-ভ্রান্তিগুলি লিয়ারের মতো যেমন গুরুতর

নয়, তেমনিই রাজকর্তব্যও ঘটিতও নয়...লিয়ার চরিত্র সাজাহানের তুলনায় অনেক বেশী জটিল। বিস্তৃতি ও গভীরতায় লিয়ারের সঙ্গে সাজাহানের কোনও তুলনা হয় না। লিয়ারের ট্র্যাজেডি- পরিকল্পনায় পিতৃস্নেহের আতিশয্যের সঙ্গে রাজকর্তব্য বিচ্যুতি ও বিচার বিভ্রান্তি যুক্ত হয়েছে। সাজাহান চরিত্রে স্নেহাতিশয্য অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে ছাপিয়ে উঠেছে।"

এ কথা মনে রাখার দরকার লিয়ারের সঙ্গে সাজাহান চরিত্রের মৌলিক প্রভেদ হচ্ছে লিয়ার মুখ্যত রাজা, গৌনতঃ পিতা। কিন্তু সাজাহান মুখ্যতঃ পিতা গৌণতঃ সম্রাট। তাছাড়া নাটকে ঔরংজীব প্রত্যক্ষভাবে সাজাহানের সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করেননি। কিন্তু লিয়ারের দুই কন্যা তা করেছেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাজাহান' আলোচনায় সাজাহানের নান সংলাপের সঙ্গে লিয়ারের সংলাপে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

মানসিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের প্রতীক হিসেবে বাইরের প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখানোর মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি। লিয়ারের অন্তরের আলোড়ন বোজাতে গিয়ে শেক্সপীয়ার যেমন বাইরের প্রকৃতিতে ঝড়-বিদ্যুতের বিপর্যয় দেখিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব দেখাতে অনুরূপ রীতি অনুসরণ করেছেন।

অন্য নাটকের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে রথীনবাবু সাজাহান ও জাহানারার মানুষ সম্পর্কে উক্তির সঙ্গে শেক্সপীয়ারের টাইমনের 'টাইমনস্ অব এথেন্স' নাটকের একটি উক্তিকে স্মরণ করেছেন –"Hate all, curse all, show charity to none" কিন্তু মানুষ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হলে মানুষ এ ধরনের উক্তি করেন। এতে প্রভাবের বা সাদৃশ্যের জের টানা সংগত নয়। মানব দরদী বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে মানুষ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া রথীন্দ্রনাথ নাটকের শেষে জহরতের উক্তির সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের রাণি মার্গারেটের অভিশাপ বাণীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদ উদ্যানের দৃশ্যে সোলেমানের নীতিগর্ভ দীর্ঘ উক্তির সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'অ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের একটি বিখ্যাত অংশের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, শেক্সপীরীয় 'Fool' চরিত্রের সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছেন – "লিয়ারের যেমন Fool মোরাদের তেমনি দিলদার। Fool যেমন লিয়ার কে তাঁহার দুষ্ট কন্যাদ্বয়ের কপটতা বুঝয়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, দিলদারও তেমনই মোরাদকে পিতৃদহিতার মহাপাপ হইতে ও ঔরংজীবের ছলনা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল'। এই মতের প্রতিবাদ করে রথীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা গ্রাহ্য হতেই পারে - '...Fool' চরিত্রের সঙ্গে দিলদারের কোনও মিল নাই বললেই হয়।...Fool লিয়ার ট্র্যাজেডির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অপরপক্ষে সাজাহানের ট্র্যাজেডির সঙ্গে দিলদারের কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই।"

৩.৫ অনুশীলনী

১) সাজাহান নাটকে সংগীতের ব্যবহার নাটকের ঘটনাপরম্পরার নিরিখে বিশ্লেষণ কর।

২) সাজাহান নাটক কি ট্র্যাজেডি বলা যাবে? যুক্তি দিয়ে বিচার কর।

৩) অ্যারিস্টটলের মতামতকে মাথায় রেখে সাজাহান নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার কর।

৪) সাজাহান নাটকের ভাষা ব্যবহার ছিল অন্যান্য নাটক থেকে অনেকটাই আলাদা, যুক্তি দিয়ে বিচার কর।

৫) সাজাহান নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব কেমন ভাবে পড়েছে আলোচনা কর।

৩.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

২) কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ,প্যাপিরাস।

৩)দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

৪)বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড, এ মুখার্জি এন্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড।

একক ৪- দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে নাটকের বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

৪.১ দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে সাজাহান নাটকের বিশ্লেষণ

৪.২ অনুশীলনী

৪.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪ উপসংহার।

৪.১ দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে সাজাহান নাটকের বিশ্লেষণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান – আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ। কাল- অপরাহ্ণ

নাটকের প্রথম দৃশ্যের সূচনা ইঙ্গিতবহ। সাজাহানের প্রথম সংলাপটি সেই ধারণাই পুষ্ট করেছে – 'তাই ত! এ বড় – দুসংবাদ দারা!' আমরা ক্রমে জানতে পারি, আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে বন্দী সাজাহান তাঁর বক্তব্যকে ও নাটকের মূল সমস্যাকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। অপরাহ্ণকালে যবনিকা উত্তোলন। মনে হয়, আসন্ন দুর্যোগের আভাস যেন এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের দিকে দিকে সম্রাটের অন্য পুত্রেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সাজাহান দ্বিধান্বিতচিত্তে দারাকে সেই বিদ্রোহ মিটিয়ে ফেলে পুত্রদের আগ্রায় প্রবেশ করার অনুমতি দিতে বলেছেন।

এই সময়ে সাজাহানের কন্যা জাহানারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং পিতার এই ভাবালুতার প্রতি আঘাত করেন। তিনি বলেন, এই বিদ্রোহী সন্তানদের কখনও ক্ষমা করা উচিত নয়। জাহানারা যুক্তিতর্কের কাছে সাজাহান হার মানলেন, কর্তব্য স্নেহকে

অতিক্রম করলো। তিনি দারাকে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন। সাজাহান মঞ্চের বাইরে সাময়িকভাবে চলে যাওয়ার পর দারার স্ত্রী এবং পুত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। নাদিরা বারবার দারা ও জাহানারাকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। জাহানারার যুক্তির কাছে নাদিরার চোখের জল বাধা পায়। শেষে তিনি দারাকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। নাদিরা পুত্রের হাত ধরে' রঙ্গমঞ্চের বাইরে চলে যান। নাদিরার প্রস্থানের অল্প-কিছুক্ষণ বাদে আবার সাজাহান মঞ্চে প্রবেশ করেন। সাজাহান জাহানারাকে অনুরোধ করলেন, জাহানারা যেন এই ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে না জড়িত থাকে; এই পাপপুরীতে জাহানারা যেন অন্ততঃ পরিত্র থাকে।

এই দৃশ্যটি সমগ্র নাটকের দ্বন্দ্বের সূচনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সম্রাট সাজাহান তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছেন পুত্রদের সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় পারস্পরিক মত্ততা। শক্তিপরীক্ষা ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অবশ্য ব্যতিক্রম শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা। তিনি বিদ্যানুরাগী, উপনিষদের দর্শনকে সাম্রাজ্যলাভের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাঁর এই ধরনের কোনও উচ্চাভিলাষ নেই। কতর্ব্যপালনে পিতৃআজ্ঞা পালনে তিনি কঠোর হতে জানেন। জনপ্রিয় দারাকে প্রজারা সম্রাটরূপে পেলে খুশি। দারা ভায়েদের দমন করে, বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সিংহাসনের প্রতি নির্বিকার। আর এই উচ্চাভিলাষ না থাকার জন্যই তাকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখী হতে হয়েছে। তেমনি সাজাহানের পুত্রদের প্রতি স্নেহাধিক্য তাঁর বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের একমাত্র আশ্রয় শাসনে তিনি বশীভূত করতে চান।

সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা রাজমহলের সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করে। এই সময়ে সাজাহানের বয়স ৬৭ বছর এবং তাঁর রাজত্বের ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকের নির্দেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আগ্রা দূর্গে যাত্রা আসেন। এখানেই তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি কেটেছে। আগ্রায় আসার আগে তিনি দারাকে বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের সম্মুখে তাঁর উত্তরাধিকাররূপে ঘোষণা করেন এবং পিতার নামে দারাকে হুকুম জারির অধিকার দেন। দারা নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির

জন্য মীরজুমলাকে অপসারিত করেন এবং অনুগতদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে সম্রাট মৃত। ফলে অন্যান্য ভাইরা দারার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে' স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে চায় এবং আগ্রা অভিজান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। মোরাদ-ও এই সময়ে গুজরাটের সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করে এবং ঔরংজীবকে তার পক্ষে আনে। দারার জ্যৈষ্ঠপুত্র সোলেমানকে পাঠানো হয় সুজার সৈন্যবাহিনীকে দমন করার জন্য। মহারাজ যশোবন্তসিংহকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ঔরংজীবের গতিরোধ করতে এবং কাশিম খাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মোরাদকে গুজরাট থেকে উৎখাত করার। যদিও এর উল্লেখ নাটকে নেই।

তিন অবাধ্য পুত্র যখন পিতাকে মৃত মনে করে, আগ্রা দূর্গ দখল করতে এগিয়ে আসছে, সাজাহান তখনও বিশ্বাস করছে স্নেহের দ্বারা তিনি এই সব কিছুকেই ঠেকাতে পারবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান – নর্মদাতীরে মোরাদের শিবির। কাল- রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখা যায়, নর্মদাতীরে মোরাদের শিবিরে ছদ্মবেশী জ্ঞানী নিয়ামৎ খাঁ মোরাদের বিদূষক রূপে 'দিলদার' নামধারী হয়ে প্রথমেই একাকী মঞ্চে প্রবেশ করে নিজের পরিচিতি প্রদান করেছেন। অল্পকাল পরেই মোরাদ শিবিরে প্রবেশ করেন। মোরাদের সঙ্গে দিলদারের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মোরাদের স্বল্পবুদ্ধি চরিত্র ও দিলদারের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সংলাপের মধ্যে দিয়ে দুটি চরিত্রই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকের এই হালকা সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করে তা আরও তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছেন, সেইজন্য এরপরই নাটকে ঔরংজীবের প্রবেশ চিত্রিত করেছেন। ঔরংজীবকে প্রবেশ করতে দেখে দিলদার প্রবেশ করেন। এর পর ঔরংজীব ও মোরাদের মধ্যে কথাবার্তা ও ভাব বিনিময় হয়। এই দৃশ্যে ঔরংজীবের যুদ্ধ কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এই মুহূর্তে ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ শিবিরে প্রবেশ করেন। মহম্মদ এসে খবর দেন রাজপুত রাজা যশোবন্ত সিংহ মোগল শিবির প্রদক্ষিণ করছেন।

মহম্মদ ও ঔরংজীব অল্পকাল পরে প্রস্থান করেন। মোরাদ সুরাপানে মত্ত হবার বাসনা প্রকাশ করেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান – কাশীতে সুজার সৈন্য শিবির। কাল- রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখি সুজা এবং তাঁর স্ত্রী পিয়ারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। তাতে জানা গেল দারার পুত্র সোলেমান সুজার বিপক্ষে সম্রাট সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে এসেছেন। পিয়ারা সুজার এই কথায় কিছুমাত্র গুরুত্ব না নিয়ে নিছক কৌতুক করতে থাকেন। এই দৃশ্যে পিয়ারার কথাবার্তায় দর্শকেরা কৌতুক বোধ করবেন। যেমন – সুজা যখন পিয়ারাকে বলেন – দিল্লী থেকে দারার পুত্র সোলেমান এসেছেন তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। তার উত্তরে পিয়ারা জানায় – "তোমার বড় ভাই দারার পুত্র... হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি! লোক পাঠাও।" আবার – "তার সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে তো ... লোক পাঠাও।" এই সব কথার মধ্যে কৌতুক প্রকাশিত হয়েছে।

পিয়ারা এবং সুজার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, সোলেমান, জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ সসৈন্যে এসেছেন দারার প্রতিনিধি হয়ে সুজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এবং সম্রাট সুজাকে পত্র দিয়েছেন যে, যদি সুজা পত্রপাঠ বঙ্গদেশে ফিরে যান, তাহলে তিনি সুজাকে এই সুবা থেকে চ্যুত করবেন না। নইলে তিনি সুজাকে বঙ্গদেশের যায়গীর থেকে বিচ্যুত করবেন। সুজা এবং পিয়ারার কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর পিয়ারা গান গাইতে শুরু করেন। এর মধ্যেই কামানের শব্দ শোনা যায়। সম্রাট সৈন্য সুজার শিবির আক্রমণ করেছে বুঝতে পেরে সুজা ও পিয়ারা প্রস্থান করে।

সোলেমান ও দিলীর খাঁ মঞ্চে প্রবেশ করেন। সোলেমান দিলীর খাঁকে সুবাদার পশ্চাদ ধাবন করার আদেশ দিলে দিলীর খাঁ প্রস্থান করেন। জয়সিংহ প্রবেশ করে জানান যে, সুজা এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তিনি বঙ্গদেশে ফিরে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর মধ্যে দিলীর খাঁ এসে জানান যে, সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকায় করে পালিয়েছিলেন। সোলেমান দিলীর খাঁকে পিছু নেওয়ার আদেশ দেন।

জয়সিংহের প্রস্থানের পর সোলেমানের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে এই দৃশ্য শেষ হয়। ভ্রাতৃবিরোধ ও গৃহযুদ্ধ যে আসন্ন এবং ঘনীভূত হতে চলেছে, তা এই দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান – যোধপুরের দুর্গ। কাল – প্রভাত।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী মহামায়া চারণী দলের সঙ্গে গান গাইছেন। এর মধ্যে দুর্গপ্রহরী এসে জানান যে, মহারাজ ফিরে এসেছেন। মহারাণী জানতে চান, মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছেন কিনা! প্রহরী জানায় যে মহারাজা পরাজিত হয়ে ফিরেছেন, কিন্তু মহারাণী কল্পনাও করতে পারেন না যে, ক্ষত্রকূলচূড়ামণি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হতে পারেন। তিনি বলেন এ ছদ্মবেশী যশোবন্ত সিংহ ! একে যেন দূর্গে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। তাই প্রহরীকে দূর্গদ্বার বন্ধ করার আদেশ দিয়ে তিনি চারণীদের সঙ্গে গান গাইতে আরম্ভ করেন।

এই দৃশ্য মহামায়ার চরিত্রে অস্বাভাবিকতা রয়েছে। মহামায়া যেন রণচন্ডিকার প্রতিনিধি। রাজপুত জাতির কি পরাজিত হয়ে দেশে ফিরতেন না? কাপুরুষের মতো যুদ্ধ না করায় অপরাধ আছে, কিন্তু যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়ার মতো অপরাধ কোথায়? তা ছাড়া যুদ্ধ-প্রত্যাগত স্বামীর সঙ্গে দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত গাওয়ার মধ্যে দেশপ্রেম যত বন্ধ না প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে অমানবিক চরিত্রের প্রকাশ – যে আচরণ নিন্দনীয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান- পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল – রাত্রি।

এই দৃশ্যের সূচনায় দেখা যায়, ঔরংজীবের একাকী কথা বলেছেন, এমন সময় মোরাদ এসে জানান যে, দারা একলক্ষ ঘোড়সওয়ার আর একশত কামান নিয়ে ঔরংজীব ও মোরাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য এসেছেন। মোরাদ এই খবর দিয়ে প্রস্থান করলে ঔরংজীবকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখা যায়। এমন সময় আবার মোরাদ এসে জানায় যে,

বিপক্ষ শিবির থেকে শায়েস্তা খাঁ ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই সংবাদে পুলকিত হয়ে ঔরংজীব প্রস্থান করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই এসে জানান যে, এখনই সকলকে আগ্রায় রওনা হতে হবে।

এই দৃশ্যে ঔরংজীবের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক কলাকৌশল সম্পর্কে দর্শকরা অবহিত হন। মোরাদকে কিভাবে রাজনৈতিক খেলার ঘুঁটি হিসাবে তিনি চালিত করছেন, দর্শকরা তা স্পষ্টই উপলব্ধি করেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান – এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির। কাল – প্রাত।

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে জানা গেল যে, ঔরংজীব শেষে যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শায়েস্তা খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দারা পরাজিত এবং পলাতক। দুর্ভাগা দারা পরাজিত, নিঃস্ব অবস্থায় দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সাজাহান তাঁর সাহায্যের জন্য স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন, তাও দস্যুরা লুট করেছে।

এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে দারার ভাগ্যরবি অস্তাচলগামী আর ঔরংজীবের সৌভাগ্য সূর্য পূর্বাচলের পথে উদিত হচ্ছে। জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল যে, তারাও এবার ঔরংজীবের পক্ষেই যোগদান করবে।

এই সময় দারার পুত্র সোলেমান এসে জানান যে, দারার সাহায্যের উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে শিবির ভেঙে দিয়ে সসৈন্য অগ্রসর হবেন। সেনাপতিদের তিনি এই আদেশ দিয়ে সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলেন। কিন্তু সোলেমানের এই কথায় জয়সিংহ কোনও সাড়া দিলেন না। তিনি বলেন, দারার আদেশ না পেলে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব, সম্রাটের হস্তাক্ষরে লিখিত আদেশপত্র জাল। সোলেমান বুঝতে পারেন, এরা কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তিনি সৈন্যদের আদেশ করেন। কিন্তু সমস্ত সৈন্যবাহিনী জয়সিংহের বশীভূত। কিন্তু জয়সিংহের বলেন – সম্রাটের আদেশ ভিন্ন তিনি এই শিবির থেকে এক পাও নড়তে পারেন না।

সোলেমান জানু পেতে এই দুই সেনাপতির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জয়সিংহের এক বিন্দু কৃপা হলো না। অকস্মাৎ দিলীর খাঁর মনের

পরিবর্তন ঘটলো। তিনি সোলেমানকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন সাহাজাদা তাকে ত্যাগ না করলে তিনিও সাহাজাদাকে ত্যাগ করবেন না। দিলীর খাঁর তাঁর সৈন্যদের আদেশ দেওয়ার জন্য প্রস্থান করলেন।

জয়সিংহের স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে দৃশ্যের শেষ হলো। এই দৃশ্যে জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার রূপটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। নাট্যকার সোলেমান এবং দিলীর খাঁর কর্তব্যপরায়ণতার মাঝে জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাবকে দেখিয়ে রাজপুতদের মহিমাকে যেন কিছুটা ক্ষুন্ন করেছেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান- আগ্রার প্রাসাদ। কাল – প্রাহ্ন।

সাজাহান ও জাহানারা কথবার্তা বলছেন। সাজাহান জানান যে, তিনি তাঁর বিজয়ী পুত্র, উদ্ধত পুত্র ঔরংজীবের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই কথা শুনে জাহানারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি জানান যে, এই শঠ, প্রবঞ্চক, শয়তান পুত্রের জন্য হতভাগ্য পিতা সাজাহান অপেক্ষা করছেন, একথা ভেবেও তিনি বিস্মিত হচ্ছেন। জ্বালাময়ী কণ্ঠে তিনি ঔরংজীবের শঠতার কথা পিতাকে জানান। কিন্তু স্নেহান্ধ সাজাহান যেন একথা বিশ্বাস করতে পারেন না। জাহানারা জানান যে, ঔরংজীব এই প্রাসাদদূর্গে এলে তিনি তাঁকে সম্রাটের চোখের সামনে বন্দী করবেন। কিন্তু সাজাহান জাহানারার মতকে সমর্থন করতে পারেন না। তিনি বলেন, বন্দী করার প্রয়োজন নেই, তিনি পিতা – পুত্রকে স্নেহে বশ করেন। আর স্নেহেও যদি ঔরংজীব বশ না মানেন, তাহলে তিনি পুত্রের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবেন। কিন্তু জাহানারা এই অপমান জনক প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নয়া। সাজাহান জানান যে, পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নেই।

ঠিক এই সময় ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ দুর্গে প্রবেশ করেন। সাজাহান মহম্মদের আগমনের কারণ জানতে চাইলে মহম্মদ জানান যে, তিনি দুর্গ করতে এসেছেন। একথা শুনে জাহানারা জানান যে, তিনি মহম্মদকে বন্দী করবেন। জাহানারা আদেশ দেন রক্ষীদের, তারা যেন মহম্মদকে বন্দী করে। মহম্মদও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

দেহরক্ষীদের ডাকলেন। মহম্মদ জানান যে, এখন থেকে সাজাহানের আর দূর্গের বাইরে যাবার অধিকার নেই। মুহূর্তের এই ঘটনায় সাজাহান স্তম্ভিত হয়ে জান। তিনি বুঝতে পারেন না – এ স্বপ্ন না সত্য। ক্রুদ্ধ সাজাহান মহম্মদ কে শাস্তি দেবার জন্য তাঁর দেহরক্ষীদের ডাকতে উদ্যত হলে মহম্মদ জানান যে, পিতা ঔরংজীবের আদেশে সাজাহানের দেহরক্ষীদের সমস্তকেই দূর্গের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন মহম্মদের হাযার সৈনিক জাঁহাপনার সেবার শতত হাজির একথা জানান। সাজাহান অভিযোগ করে মহম্মদকে বিশ্বাসঘাতক বলেন, একবার দূর্গের বাইরে জাবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু মহম্মদ এক কথা – পিতার অবাধ্য তিনি হতে পারবেন না কোনমতেই।

সাজাহান তাঁর রাজমুকুট ও কোরান স্পর্শ করে মহম্মদকে বললেন যে, মহম্মদ যদি একবার তাঁকে দূর্গের বাইরে জাবার অনুমতি দেন, তাহলে এই ক্ষণে সাজাহান তাঁকে নিজের রাজমুকুট পরিয়ে ভারতের নবনির্বাচিত সম্রাট হিসেবে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু মহম্মদ জানান যে, একটা রাজ্য তো তুচ্ছ, সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও তিনি পিতার অবাধ্য হতে পারবেন না। তিনি বলেন, মানুষের হৃদয় বড় দুর্বল ও প্রলোভন সামলে ওঠা কঠিন কাজ, তাই দূর্গ ছেড়ে চলে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। মহম্মদের পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে জাহানারা হতবাক্। ঔরংজীব পিতাকে ছলে বন্দী করেছেন আর তারই পুত্র মহম্মদ পিতার আদেশ রক্ষার জন্য একটা সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। জাহানারার কথা শুনে সাজাহান উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় জগতের সমস্ত পিতাদের উদ্দেশ করে বললেন, জগতে স্নেহ ভালোবাসার কোন মূল্য নেই। সব পিতা যেন কঠোর শাসনে তাদের শিশুসন্তানদের মানুষ করে।

জাহানারা সাজাহানকে বলেন, তাঁর এই নিষ্ফল ক্রন্দন মূল্যহীন। শয়তানের মত ক্রুড় না হলে ঔরংজীবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। জাহানারার কথায় সাজাহানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এই দৃশ্যটি শেষ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান – মথুরায় ঔরংজীবের শিবির। কাল- রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতে দিলদারের মুখে মোরাদের হাস্য পরিহাসের মধ্যে ঔরংজীবের আগমন ঘটে। ঔরংজীব দিলদারের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারেন মোরাদের এই সুচতুর বিদূষকটিকে তাঁর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে। মোরাদ বুদ্ধিহীন, সুরাসক্ত, নৃত্যগীতপ্রিয়। এই সুযোগকে কৌশলী ঔরংজীব হাতছাড়া করতে পারেন না। তিনি মোরাদকে তাই আরও বেশী করে মদ্যপান করার সুযোগ দিয়ে তাঁকে মাতাল করে তোলেন। মদের প্রভাব এবং নর্তকীদের নাচে যখন মোরাদ অন্যজগতে বিচরণ করছে, সেই সময়ে ঔরংজীব তাকে বন্দী করলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান – আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ। কাল – প্রভাত।

সাজাহানের স্বগতঃ ভাষণের মধ্য দিয়ে এই দৃশ্য শুরু হলো। অল্পকাল পরে জাহানারা প্রবেশ করলেন। জাহানারার মুখে জানা গেল যে, ঔরংজীব শত হলেও তাঁর পুত্র। পুত্র অন্যায় করলেও বৃদ্ধ পিতা জীবিত থাকতে সে কি করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করবে? জাহানারা জানান, যে ব্যক্তি পিতাকে কৌশলে বন্দী করতে পারে, ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে – সে সবই করতে পারে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান- রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ। কাল- দ্বিপ্রহর দিবা।

ভাগ্যবিড়ম্বিত দারা ঔরংজীবের অত্যাচারে রাজপুতানার মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছেন। সঙ্গে স্ত্রী ও পুত্রকন্যা। সকলেই পরিশ্রান্ত, দারার পুত্র জলপিপাসায় অস্থির হয়ে পড়েছে। জলপিপাসায় ক্লান্ত পুত্র সিপার ও স্ত্রী নাদিরার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দারা নিজের হাতেই তাদের হত্যা করতে উদ্যত হলেন। মাতা পুত্র উভয়ে উভয়কে

রক্ষা করার জন্য আকুল কিন্তু রক্ষা করার ক্ষমতা কোথায়? মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নাদিরা শেষ প্রার্থনায় রত হলেন এবং তাদের সাথে দারাও প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

এমন সময়ে গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণী প্রবেশ করে দারার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল এবং সকলে গোরক্ষকের আশ্রয়ের দিকে রওনা হলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান – মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ। কাল – জ্যোৎস্না রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতেই দেখা গেল, সুজার স্ত্রী পিয়ারা একাকী গান গাইছিলেন, এমন সময়ে সুজা সেখানে প্রবেশ করলেন। সুজার বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে পিয়ারা গান গেয়েই চললেন। অবশেষে সুজার বক্তব্যের মধ্যে থেকে জানা গেল যে, দারা ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে দুবারই পরাজিত হয়েছেন। এবার সুজার ভাগ্যবিপর্যয়ের শুরু। সুজা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কি করা উচিত এ প্রশ্ন নিয়েই পিয়ারার কাছে উপস্থিত হয়, পিয়ারা জানায় যে, তাঁর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই উচিৎ। তাঁর কাছে এ যুদ্ধ জয় করে রাজ্য লাভ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ পিয়ারা তাঁর স্বামীর প্রেমের মধ্যেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী বলে নিজেকে মনে করেছেন। কিন্তু সুজা পিয়ারার মতো কল্পনাপ্রবণ নন, তাই পিয়ারার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলেন না, পিয়ারার উক্তির মধ্যে দিয়েই এ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল।

নাট্যকার এই দৃশ্যে পিয়ারার সংলাপের মধ্যে স্বাভাবিকতা দেখা যায় নি। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার হাস্যরসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান – দিল্লীতে দরবার কক্ষ। কাল – প্রাত

ঔরংজীবের দরবারের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই দৃশ্যের শুরু যশোবন্ত সিংহ এবং ঔরংজীব কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের কথার মধ্যে থেকে জানা গেল যে, রাজপুত যশোবন্ত সিংহ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চান কি অপরাধে আজ ভারত-সম্রাট বন্দী আর কোন্ শর্তে পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও ঔরংজীব নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন।

যশোবন্ত সিংহের বীরত্বব্যঞ্জক কথায় ঔরংজীবের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে তিনি যশোবন্ত সিংহকে নিজের সম্পর্কে সাবধান হতে বলেন। বীর যশোবন্তের কাছে ঔরংজীবের রক্তচক্ষু নেহাৎই তুচ্ছ সামগ্রী। কিন্তু যশোবন্তের বীরত্বব্যঞ্জক আচরণ ঔরংজীব এবং তাঁর কর্মচারীরা সহ্য করতে পারেন না। শায়েস্তা খাঁ জানান যে, ভারত-সম্রাট ঔরংজীবের সামনে যশোবন্ত সিংহের এ হেন আচরণ অত্যন্ত খারাপ ও অভব্যনীয়। ঠিক এই সময় ঔরংজীবের ভগ্নী জাহানারা প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ভারতের সম্রাট ঔরংজীব নন, ভারতের সম্রাট সাজাহান।

ঔরংজীব ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূণ্য হয়ে প্রথমে মহম্মদকে বলেন জাহানারাকে রাজ দরবার থেকে বাইরে নিয়ে যেতে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কৌশলী মন সচেতন হয়ে ওঠে। তিনি নরম সুরে বলেন, সম্রাট নন্দিনীর পক্ষে এই প্রকাশ্য দরবারে এসে দাঁড়ানো শোভা পাই না। একথার পরেও যখন জাহানারা দরবার থেকে বাইরে যেতে অস্বীকৃত হন, তখন কার্যোদ্ধারকারী ঔরংজীব তাঁর সভাসদ্‌দের সম্রাট-দুহিতার সম্মানার্থে সভা ত্যাগ করতে অনুরোধ জানান। সকলে সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হলে জাহানারা তাঁদের বলেন যে, তিনি সম্রাট সাজাহানের জন্যই আজ এই দরবারে উপস্থিত, শেষবারের মতো তিনি জানতে চান – প্রজারা সম্রাট সাজাহানকে চায় কি না? জাহানারার দীপ্ত কণ্ঠে সকলের অভিভূত হয়ে পড়লেন, সমস্বরে ঔরংজীবের দরবারে ধ্বনিত হলো – 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়'। কৌশলী ঔরংজীব এইবার নূতন চাল চাললেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি সাজাহানের হাত থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেননি, নিয়েছেন দারার হাত থেকে। কারণ দারার রাজত্বে বিশৃঙ্খলা আনতে গিয়ে তিনি মহাতীর্থ মক্কার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যই যদি সকলের কাম্য হয় তো তিনি এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করে মক্কায় চলে যেতে প্রস্তুত।

ঔরংজীবের এই ভাষণে আবার সভাসদ্‌রা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'জয় সম্রাট ঔরংজীবের জয়।' এরপর একমাত্র জাহানারা ও ঔরংজীব বিভিন্ন সকলেই প্রস্থান

করলেন। জাহানারা ঔরংজীবের উপস্থিত বুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞান দেখে অভিভূত – জাহানারার উক্তিতে এই দৃশ্য শেষ হলো।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান – খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল – রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখা গেল, ঔরংজীব একখন্ড পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখছিলেন। এ সময়ে মীরজুমলা প্রবেশ করেন। মীরজুমলাকে ঔরংজীব জানালেন যে, এই যুদ্ধে তাদের জয় হবে। কি প্রকারে যুদ্ধ চালিত হবে সেই বিষয়ে ঔরংজীব মীরজুমলাকে নির্দেশ দিলেন। মীরজুমলা প্রস্থান করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ প্রবেশ করেন। মহম্মদকেও ঔরংজীব আগামী যুদ্ধ সম্পর্কেই নির্দেশ দিলেন। মহম্মদ প্রস্থান করলেন। অল্পকাল পরেই দিলদারের সঙ্গে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করে ঔরংজীবকে কুর্নিশ করলেন। যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে কথাবার্তার সময়েও ঔরংজীব তাঁকে এই যুদ্ধের কথাই বললেন। ঔরংজীবের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল, ঔরংজীব যশোবন্ত সিংহের প্রতি খুব বিশ্বাসী নন। যশোবন্ত সিংহকে এই যুদ্ধে সঙ্গে না আনলে হয়তো ঔরংজীবের অনুপস্থিতিতে আগ্রায় বিভ্রাট বাধাবেন – সেই আশঙ্কাতেই কেবলমাত্র ঔরংজীব যশোবন্ত সিংহকে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে এনেছেন। যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের কথাতে অপমানিত বোধ করেন ঔরংজীব বলেন, তিনি যশোবন্ত সিংহকে এই মুহূর্তে বন্দী করলে কে তাঁকে রক্ষা করবে! বীর যশোবন্ত সিংহ উত্তর দিলেন – ‘এই তরবারি’ এই বলে যশোবন্ত সিংহ প্রস্থান করলেন।

ঔরংজীব এইবার দিলদারকে বলেন, তিনি এই রাজপুত জাতটাকে সম্পূর্ণ চিনতে পারলেন না। দিলদারকে বলেন, ঔরংজীবের রাজপুত জগতের সঙ্গে পরিচয় নেই। রাজপুতদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়ো।

ঔরংজীব প্রস্থান করলেন। অল্পকাল পরেই আবার ঔরংজীব ও মীরজুমলা কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন। ঔরংজীব মীরজুমলাকে যশোবন্ত সিংহের প্রতি সর্তক দৃষ্টি

রাখতে বললেন, খুব সাবধানে সবদিকে প্রস্তুত হতে বলে তিনি পুত্র মহম্মদের শিবিরে প্রবেশ করলেন।

মীরজুমলার উক্তির মধ্য দিয়ে জানা গেল, এই যুদ্ধে এই যুদ্ধে ঔরংজীব খুব বিচলিত। দিলদার বললেন, উত্তেজনার কারণ এই যুদ্ধ চলেছে ভা'য়ে ভা'য়ে। পৃথিবীতে ভাই-এর চেয়ে বড়ো শত্রু বোধ হয় আর কেউ নেই। সকলের প্রভুত্ব মানুষ স্বীকার করে নিতে রাজী। কিন্তু ভাই-এর প্রভুত্বটুকু কেউ মেনে নিতে রাজী নয়। মীরজুমলা এবং দিলদার কথা বলতে প্রস্থান করলেন, দৃশ্যটি শেষ হলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান- খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল- সন্ধ্যা।

সুজা একখানি মানচিত্র গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, এমন সময়ে একটি ফুলের মালা হাতে পিয়ারা গান গাইতে প্রবেশ করলেন। গানটি শেষ হলে পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় পরিয়ে দিলেন। সুজা পিয়ারা কে বললেন যে, তিনি একটা ভাবনায় পড়ে গেছেন। হাতের মানচিত্র দেখিয়ে আগামী কালের যুদ্ধে ঔরংজীবের পক্ষের সৈন্য কে কোথায় অবস্থান করবেন সেই কথা বলবেন। এই যুদ্ধের গুরুত্বের কথা মনে করে সুজা খুব চিন্তিত, পিয়ারার হাস্যকৌতুক পূর্ণ কথাও তিনি ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। পিয়ারার গানে সুজার ক্লান্ত মনে কিছুটা শান্তি আসতে পারে। এই মনে করে সুজা পিয়ারাকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। পিয়ারা গান গাইবার আগে, অনেক ক্ষণ সুজার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সুজার কথা তে জানা গেল সে কোনও ধর্ম বা নীতি কিছু মানতে প্রস্তুত নয়। যদিও বা দারার প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী ছিল, কিন্তু ছোটো ভাই ঔরংজীবের প্রভুত্ব সে কিছুতেই স্বীকার করতে পারবে না। পিয়ারা ও সুজার কথাবার্তা শেষ হলে, পিয়ারা গান গাইলেন, গানের পরেই দৃশ্যটি শেষ হল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান – আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল- রাত্রি।

এই দৃশ্য শুরু হল দারা ও নাদিরার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। দারার উক্তির মধ্যে তাঁর বিড়ম্বিত ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। নাদিরা দারাকে প্রশ্ন করেন, এখনও দারা কি ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত? এই প্রশ্নের উত্তরে দারা জানালেন, যতদিন ঔরঙ্গীজীব সাজাহানকে সংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করে, দারা ততদিন পর্যন্ত ঔরংজীবের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। দারার এই সংকল্পকে নাদিরা ঠিক সমর্থন করতে পারলেন না। এই অনিশ্চিত জীবন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। পুত্র কন্যা ও দারার এই দুর্ভাগ্যকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

নাদিরার এই কথাতে দারা আহত হলেন, এবং নাদিরার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে প্রস্থান করলেন।

অল্পকাল পরেই দারা স্বীয় ভুলের জন্য নাদিরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এই সময় একজন বাঁদী এসে জানাল যে, দারার দর্শনপ্রার্থী গুজরাটের সুবাদার শাহানবাজ বাইরতেও অপেক্ষা করছেন। শাহানবাজ এবং দারার কথোপকথনের মধ্য থেকে জানা গেল যে, শাহানবাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং তিনি যশোবন্ত সিংহের কাছে দারার পক্ষে সাহায্য করার জন্য আবেদন পাঠিয়েছেন। অবশেষে শাহানবাজ এই ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবরাজের পরিবারকে আশ্রয় দান করলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান- কাশ্মীরের মহারাজ পৃথ্বীসিংহের প্রমোদ-উদ্যান। কাল- সন্ধ্যা।

এই দৃশ্যের শুরু হল সোলেমানের স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে। সোলেমানের কথা থেকে জান গেল যে, পিতার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে সে এই রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমন সময়ে দেখা গেল গান গাইতে গাইতে কয়েকটি সুসজ্জিতা তরুণী একটি নৌকা বেয়ে প্রমোদোদ্যানের দিকে আসছে। তরুণী দলের মধ্যে একজন সোলেমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানল এবং নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল যে, সে কাশ্মীরের প্রধানা নর্তকী এবং রাযার প্রেয়সী গণিকা। সোলেমানকে সে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে

আহ্বান জানাল। সোলেমান অস্বীকৃত হলে তরুনী দল প্রস্থান করল। এই দৃশ্য কাশ্মীররাজ পৃথ্বীসিংহের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তিনি সোলেমানকে দোষী সাব্যস্ত করে লঘুচিত্ত উৎশৃঙ্খল বলে অভিযুক্ত করলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান- এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির। কাল- রাত্রি।

ঔরংজীবের স্বগতোক্তিতে এই দৃশ্যের শুরু। তাঁর কথোপকথনে জানা গেল যে, যশোবন্ত সিংহ অতর্কিত আক্রমণে ঔরংজীবকে বিপর্যস্ত করেছেন। তাছাড়া আরও জানা গেল, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন।

এমন সময়ে জয়সিংহ প্রবেশ করলেন। ঔরংজীব বললেন, জয়সিংহকে বললেন যে, তিনি যেন যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে কথা বলেন ও বুঝিয়ে বলেন যে, এই যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ যেন কোন পক্ষকেই সমর্থন না করেন। যদি এমনটা হয়, সেক্ষেত্রে ঔরংজীব শুধুমাত্র তাকে ক্ষমাই করবেন না, উপরোন্তু গুর্জর প্রদেশের অংশ তাকে দান করতেও প্রস্তুত আছেন। জয়সিংহ প্রস্থান করলেন। এই সময় ঔরংজীবের কথা থেকে জানা গেল, তিনি সমস্ত দিক প্রায় গুছিয়ে নিলেও স্বীয় পুত্র মহম্মদ সম্পর্কে তিনি রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কেননা মহম্মদের চোখে তিনি পিতার সম্পর্কে এক অবিশ্বাসের ছায়া দেখেছেন। এমন সময় মহম্মদ ঔরঙ্গজীবের কক্ষে প্রবেশ করেন, এবং পিতাকে প্রশ্ন করেন, সম্রাট সাজাহান কি বন্দী আছেন? সেই সময় ঔরংজীব জানান যে, বন্দী নয়, বিশেষ কারণে সাজাহানকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আরও জানালেন যে, প্রয়োজনেই তিনি মোরাদকে বন্দী করেছেন, এবং বিশেষ প্রয়োজনেই তিনি সিংহাসনে বসেছেন। অবশেষে বললেন, রাজনৈতিক কূট ব্যাপার, তাই এই বিষয়ে তার কোনও রকমের বিশেষ কৌতুহল না দেখানোই ভাল। তখন মহম্মদ জানালেন যে, এই রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই, আরও জানালেন, পিতার উপর বিশ্বাস তাঁর একপ্রকার উঠে গেছে, সাজাহানকে বন্দী করার ঘটনা তাকে আর বিভ্রান্ত করে তুলেছে। সম্রাট ঔরংজীবকে বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এর উত্তরে

ঔরংজীব জানালেন, মহম্মদের পিতৃভক্তি বিনষ্ট করা উচিৎ নয়, কেননা এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন মহম্মদ স্বয়ং।

কিন্তু নির্লোভ মহম্মদ জানালেন যে, তিনি এই সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট হতে চান না, যে সাম্রাজ্য হাযার হাযার প্রতারণা দিয়ে লাভ করতে হয়, এর থেকে বিড়ম্বনার আর কিছু হতে পারে না। আর সাম্রাজ্যের বিনিময়ে ঔরংজীব জা হারালেন, তা হল একজন নিষ্ঠাবান ঐকান্তিক পুত্রের সাহচর্য। পিতৃভক্তি বিনিময়ে একদিন ভারত সাম্রাজ্যকেও উপেক্ষা করেছিলেন, সেই পিতৃভক্তি ঔরংজীব হারালেন। মহম্মদের পক্ষে আর তাকে ভক্তি করা সম্ভব নয় – একথা মহম্মদের উক্তি থেকে জানা গেল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান- যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ। কাল- মধ্যাহ্ন।

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেচেন। এঁদের কথা থেকে জানা গেল, যশোবন্ত সিংহ জয়সিংহের প্রস্তাব সমর্থন করেননি। কিন্তু জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহকে ঔরংজীবের ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কারণ ঔরংজীব এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে হারেননি। জয়সিংহের কথাকে সমর্থন করে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের বীরত্বকে করলেন সত্য, কিন্তু বললেন যে, খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ তাঁর চাই – ঔরংজীবের বশ্যতা তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। আর তার চেয়েও কথা, তিনি এই খল ঔরংজীবকে সহ্য করতে পারেন না। জয়সিংহ জানতে চাইলেন তাহলে যশোবন্ত সিংহ খিজুয়া যুদ্ধ ঔরংজীবকে সাহায্য করেছিলেন কেন? যশোবন্ত সিংহ জানালেন দিল্লীর রাজসভায় ঔরংজীবের কূট চাল তিনি সেদিন বুঝতে পারেননি। তাঁর ত্যাগের অভিনয়, ভান দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন আর তাই তিনি ঔরংজীবকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু খিজুয়া যুদ্ধে তিনি ঔরংজীবের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হলেন।

জয়সিংহ জানালেন, এবারের যুদ্ধে যদি যশোবন্ত সিংহ কোনও পক্ষকেই সমর্থন না করেন, তাহলে ঔরংজীব তাকে গুর্জর প্রদেশ দান করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর

তাছাড়া এ যুদ্ধ দারা বা ঔরংজীব যারই জয় হোক না কেন, তাতে রাজপুত রাযাদের কি আসে যায়!

তারপর যশোবন্ত সিংহ জানালান যে, রাজপুত রাযারা যদি এক দেশের জন্য লড়াই করেন, তাহলে অনায়াসে মোগলশক্তি ভিতরকে ভেঙে ফেলা যায়। তারপর রাজপুত রাণা রাজসিংহ সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু জয়সিংহ জানালেন, তিনি ঔরংজীবের প্রভুত্ব যদিও বা মেনে নিতে পারবেন, রাজসিংহের প্রভুত্ব তিনি স্বীকার করবেন না। তাছাড়া এই নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করে তিনি অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে রাজী নন। একথা বলে জয়সিংহ প্রস্থান করলেন। যশোবন্ত সিংহ একাকী বলতে লাগলেন, হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা আর বোধ হয় সম্ভব নয়। এ যুদ্ধে যা হয় হোক। কারণ দারা বা ঔরংজীব যার জয় হোক তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। নর্মদার অপমানের প্রতিশোধ তিনি খিজুয়ার যুদ্ধে নিয়েছেন।

এমন সময়ে মহামায়া প্রবেশ করে জানালেন খিজুয়ার যুদ্ধ প্রতিশোধ নয়। বরং ঔরংজীবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি রাজপুত চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ করেছেন। মহামায়া তাঁর উদীপ্ত উক্তিতে রাজাকে বিদ্ধ করেন। তিনি জানান মাড়বারের গৌরব যশোবন্ত সিংহকে তিনি বীরের রূপেই দেখতে দেখতে চান, তিনি চান না যে রাজপুত গৌরব- মাড়বারের গৌরব যশোবন্ত সিংহের হাতে বিনষ্ট হয়। মহামায়ার কথা শেষ হলে যশোবন্ত সিংহ প্রস্থান করেন। এমন সময়ে চারণ বালকগণ প্রবেশ করলেন। মহামায়া তাদের গান গাইতে বললেন। চারণ বালকেরা গাইতে লাগলেন –

“ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।
চারণ বালকদের গান শেষ হলে এই দৃশ্যটিও শেষ হলো।”

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান – টান্ডায় সুজার প্রাসাদকক্ষ। কাল – সন্ধ্যা।

পিয়ারা একা গান গাইছিলেন, এমন সময়ে সুজা প্রবেশ করে জানালেন যে, দারা শেষ যুদ্ধেও ঔরংজীবের কাছে পরাজিত হয়েছেন, এবং শাহানবাজও তাঁর জামাই ঔরংজীবের বিপক্ষে লড়ে মারা গেছেন। সুজার কথা থেকে জানা গেল যে, ঔরংজীব পুত্র মহম্মদ পিতাকে ত্যাগ করে সুজার পক্ষে সমর্থন করেছেন। পিয়ারা ও সুজার কথাবার্তার মধ্যে বাঁদী এসে জানালো যে, একজন ফকির দেখা করতে চান। সুজা তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললেন। পিয়ারা প্রস্থান করলেন। পিয়ারার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী দিলদারের প্রবেশ। দিলদার সুজাকে একখানি পত্র দিলেন, এবং জানালেন যে সুজাকে যেন এই পত্র না দেওয়া হয়। তিনি স্বয়ং সুজাকে মহম্মদ মনে করে এই পত্র দান করলেন। সুজা ঠিক ব্যাপার বুঝতে না পেরে দিলদারকে প্রস্থান করতে বললেন। দিলদারের প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহম্মদ প্রবেশ করলেন।

পত্র থেকে জানা গেল যে, মহম্মদ সুজাকে বিপর্যস্ত করার জন্যই সুজার পক্ষ সমর্থন করেছেন। মহম্মদ শপথ করে বলেন পত্র তাঁর লেখা নয়, এ জাল পত্র। কিন্তু সুজা পক্ষ সমর্থন করেছেন। মহম্মদ শপথ করে বলেন পত্র তাঁর লেখা নয়, এ জাল পত্র। কিন্তু সুজা বিশ্বাস করেন না। মহম্মদকে তিনি বিতাড়িত করেন। মহম্মদ প্রস্থান করার কিছুকাল পরে পিয়ারা প্রবেশ করলেন। সুজা তাঁকে সব খুলে বললেন। কিন্তু পিয়ারা সব শুনে বুঝতে পারলেন এ ঔরংজীবের ছল এবং এ পত্রও জাল। পিয়ারার কথায় সুজার চৈতন্য হলো। তিনি আবার মহম্মদকে শান্ত করতে চললেন। বললেন, নিজের কন্যার সঙ্গে মহম্মদের বিয়ে দিয়ে মহম্মদকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ, ঘরে বাইরে শত্রু। এ সময়ে ঐরংজেবের পুত্রের দূরে থাকাই ভাল, বিশেষ করে ঔরংজীব সুজার প্রধান শত্রু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান – জিহন খাঁর গৃহে দারার কক্ষ। কাল – রাত্রি।

সিপার ও জহরৎ দুজনের কথাবার্তায় এ দৃশ্য শুরু হলো। জহরৎ বলছে এ অনিশ্চিত জীবনে তার কাছে অসহ্য। সে যদি পুরুষ হতো তাহলে এর একটা ব্যবস্থা এতদিনে করতো। সিপার জানতে চাইল কি উপায়ে সম্ভব। জহরৎ জানায়, সিপার বালক – তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তাই দিল্লীতে গিয়ে ঔরংজীবের বুকে ছোরা বসিয়ে সিপার এই অন্যায়ের প্রতিকার করুক। সিপার এই হত্যা কার্যে রাজী হতে পারে না। জহরৎ সিপারকে কাপুরুষ বলে অভিযোগ জানায়। কিন্তু সিপার জানায় যে, সে কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ করতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু এই অন্যায় হত্যাকার্য তার দ্বারা সম্ভব নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান – নাদিরের শয়নকক্ষ। কাল – রাত্রি।

এই দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল নাদিরাও মৃত্যুশয্যায় শয়ান। নাদিরার কথা থেকে জানা গেল যে, দারা সপরিবারে জিহন খাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। দারা ও নাদিরার কথা থেকে জানা গেল, জিহন খাঁ সম্পর্কে তাদের একটা ভীতি রয়েছে। কিন্তু নাদিরা দারাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, জিহন খাঁকে দারা অনেকবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, জিহন খাঁও নিশ্চয় তার প্রতিদানে দারাকে রক্ষা করবেন। এই কথাবার্তার মধ্যে নাদিরার মৃত্যু ঘটলো আর নাদিরার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চারজন সৈনিকসহ জিহন খাঁ এসে দারাকে বন্দী করলেন। দারা জিহন খাঁকে অনুরোধ জানালেন নাদিরার মৃতদেহ যেন জিহন খাঁ অনুগ্রহ করে লাহোরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে সম্রাটের পরিবারের কবরভূমিতেই যেন নাদিরাকে কবর দেওয়া হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান-যোধপুরের প্রাসাদ। কাল- সায়াহ্ন।

এই দৃশ্যে যশোবন্ত সিংহ ও তাঁর স্ত্রী মহামায়ার কথা থেকে জানা গেল, ঔরংজীবের প্রস্তাব সমর্থন করায় যশোবন্ত সিংহ গুর্জর প্রদেশ পেয়েছেন। যশোবন্ত সিংহের এই আচরণে তাঁর মহিষী অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি মহারাজের এই কাজকে সমর্থন করতে পারছেন না। যে দারা যশোবন্ত সিংহের প্রভু ছিলেন, তাঁকে আশা দিয়ে প্রতারণা করায় মহারাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সমস্ত রাজপুতানা মহারাজের এই কার্যের জন্য মহারাজকে নিন্দা করছেন। সেই অপমান মহামায়া সহ্য করতে পারছেন না।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান- আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ। কাল – রাত্রি।

সাজাহান ও জাহানারা নিজেদের মধ্যে দুজনে কথাবার্তা বলছেন। তাদের কথা থেকে জানা গেল সুজা আরাকানের রাযার আশ্রিত, মোরাদ গোয়ালিয়রে বন্দী। অবশিষ্ট দারা বহু সংগ্রামের পর ঔরংজীবের হাতে বন্দী হয়েছেন। এবং জিহন খাঁ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। একথা শোনার পর সাজাহান ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন – যদি ঔরংজীব দারাকে হত্যা করে! সাজাহান উন্মত্তপ্রায় হয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইরে আসার চেষ্টা করতে চাইলেন, যদি দারাকে বাঁচানো যায়। জাহানারা বললেন, এ নিষ্ফল প্রচেষ্টা। এই প্রাসাদ দুর্গ থেকে ঝাঁপ দিলে মৃত্যু অনিবার্য। জাহানারার কথায় সাজাহানের চৈতন্য হলো। তিনি করুণভাবে ঈশ্বরের নিকট তাঁর হৃদয়ের আর্তি জানাতে লাগলেন আর কামনা করলেন শত্রুরও যেন কোনও দিন পুত্র না হয়!

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান - ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল – সন্ধ্যা।

এই দৃশ্যের শুরু হয় ঔরংজীবের স্বগতঃ উক্তির মধ্য দিয়ে। দারার মৃত্যুদণ্ডকে তিনি কাজীর বিচার বলে' মনে করে নিজের কাছে নিজের সাফাই গাইছেন। এমন সময় দিলদার প্রবেশ করলেন। দিলদার ঔরংজীবকে তাঁর অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে

দিয়ে বললেন, ঔরংজীব যাকে কাজীর বিচার বলে' ঘোষণা করে নিজে আশ্বস্ত, তা প্রকৃত কাজীর বিচার নয় – কারণ কাজীর বিচারের পিছনে রয়েছে ঔরংজীবের রক্তচক্ষু। সুতরাং দারার এ প্রাণদন্ডের আদেশ কাজীর বিচার নয়। বিচারের প্রহসন মাত্র। ঔরংজীব একথা শোনার পর শায়েস্তা খাঁকে ডাকার জন্য দিলদারকে হুকুম দিলেন। দিলদারের প্রস্থানের অল্পকালের মধ্যেই জিহন খাঁ ও শায়েস্তা খাঁ প্রবেশ করলেন। ঔরংজীব তাদের জানালেন যে, তিনি দারার মৃত্যুদন্ড প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁ দুজন মিলে ঔরংজীবকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, দারা অত্যন্ত জনপ্রিয় – তার প্রাণ রক্ষা করে ঔরংজীবের পক্ষে রাজ্য চালনা সম্ভব নয়। কারণ প্রযারা দারার পক্ষ সমর্থন করে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। অবশেষে ঔরংজীব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে দারার মৃত্যু দন্ডের আদেশপত্র সমর্থন করে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলেন। জিহন আলি আদেশপত্র নিয়ে প্রস্থান করার একটু পরেই ঔরংজীব তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঔরংজীবের এই ইতস্ততঃ ভাব দেখে ও দ্বিধা –দ্বন্দ্ব দেখে শায়েস্তার মনে হলো, তাহলে ঔরংজীবের মধ্যেও একটা হৃদয় আছে!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান- খিজিয়াবাদের কুটীর। কাল - রাত্রি ।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখা যায় বন্দী দারা কারাগারে বসে আছেন, পাশে সিপার নিদ্রিত। দারার স্বগতোক্তির মাঝখানে দিলদার প্রবেশ করলেন। অপরিচিত এ ব্যক্তিকে দেখে দারা তার পরিচয় জানতে চাইলেন। দিলদার পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তিনি ঔরংজীবের সভাসদ্। এ অবস্থায় ঔরংজীবের সভাসদ্কে দেখে দারা আহত হলেন। তিনি দিলদারকে প্রশ্ন করলেন, হতভাগ্য দারাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই কি দিলদার এখানে এসেছেন? দারার এই অভিযোগ শুনে দিলদার জানালেন যে, সে রকম কোন অভিপ্রায় তাঁর নেই। তারপর দারা ও দিলদারের কথোপকথন থেকে জানা গেল, দিলদার দারার প্রাণরক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছেন। তিনি বার বার দারাকে অনুরোধ

করলেন, তাঁর সঙ্গে পোশাক বদল করে দারা কারাগার ত্যাগ করে চলে জান – কেউ যাতে সন্ধেহ না করে। কিন্তু দারা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। এঁদের কথাবার্তার মধ্যেই দারার প্রাণদন্ডের আদেশ-পত্র নিয়ে জিহন খাঁ এসে উপস্থিত হলো। দিলদারের অনুরোধ-উপরোধে কিছুতেই কিছু হলো না। জিহন খাঁ বলেন – সম্রাটের আদেশ, কাজীর বিচার উপেক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই। কতর্ব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়ে দিলদার দারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এমন অবস্থায় জিহনের আদেশে দুজন ঘাতক প্রবেশ করলো।

দারা ঘুমন্ত পুত্র সিপারকে জাগিয়ে দিয়ে তার কাছে শেষ বিদায় চাইলেন। সিপারের আকুতি, মিনতি, দারার চোখের জল সব ব্যর্থ হলো, সিপারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে দারাকে বধ করা হলো। দারার ছিন্নমুন্ড ঘাতকেরা এনে জিহন আলীর কাছে সমর্পন করল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান – দিল্লীর দরবারগৃহ। কাল – প্রাত।

এই দৃশ্যের শুরুতে দেখা গেল, দিল্লীর দরবার কক্ষে ঔরংজীব তাঁর পাত্রমিত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় রত। তাদের আলাপের মধ্য থেকে জানা গেল, ঔরংজীব তাঁর পূর্বপরিশ্রুতি অনুযায়ী যশোবন্ত সিংহকে গুর্জর প্রদেশ দান করেছেন। সুজাকে আরাকানের সীমা পর্যন্ত বিতাড়িত করা হয়েছে, মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী, এমন কি ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হয়েছে। দারার পুত্র সোলেমানকে দিলীর খাঁ শ্রীনগর থেকে বন্দী করে এনেছেন। ঔরংজীব সোলেমানোকে দরবারে নিয়ে আসার জন্য দিলীর খাঁ কে আদেশ দিলেন। দিলীর খাঁ চলে যাওয়ার পর মহারাজ জয়সিংহ জানলেন যে, জিহন খাঁর প্রজারা তাঁকে হত্যা করে দারার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে। এঁদের কথাবার্তার মধ্যেই দিলীর খাঁ সোলেমানকে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। ঔরংজীব সোলেমানকে জানালেন সোলেমানকে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। এঁদের কথাবার্তার মধ্যেই দিলীর খাঁ সোলেমানকে নিয়ে দরবারে প্রবেশ

করলেন। ঔরংজীব সোলেমানকে জানালেন সোলেমানের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজনেই তিনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন। সোলেমানের ওপর তাঁর কোনও রাগ বা বিদ্বেষ নেই। সোলেমান জানালেন, তিনি ঔরংজীবের কৈফিয়ৎ শুনতে চান না। পিতৃহন্তার কাছ থেকে একবিন্দু করুণাও তিনি চান না। বরং ঔরংজীবের অনুগ্রহকে তিনি ঘৃণা করেন। সোলেমানের কথাতে ক্ষুব্ধ ঔরংজীব সোলেমানের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বালকবেশিনী জহরৎউন্নিসা সভাকক্ষে প্রবেশ করে ঔরংজীবকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। সোলেমান তাঁকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন। জহরৎ উন্মাদের মত ঔরংজীবের দিকে ধাবিত হলো ও অতিরিক্ত উত্তেজিত হওয়ার ফলে শেষে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়োলো। ঔরংজীব সোলেমানের মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে এবং জহরৎকে আগ্রার প্রাসাদদুর্গে সাজাহানের কাছে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান- আরাকানের রাযার প্রাসাদ। কাল- রাত্রি।

সুজা পিয়ারার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এ দৃশ্যের শুরু। সুজার কথা থেকে জানা গেল যে, সুজার আশ্রয়দাতা আরাকান রাজা এবার তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে প্রস্তুত। আরাকানের রাযার মনে ধারণা হয়েছে, সুজা তাঁর মাত্র চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে আরাকান রাজ্য জয় করবার অভিপ্রায়েই এই রাজ্যে এসেছেন। সুতরাং তিনি একরাত্রির মধ্যেই সুজাকে আরাকান ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কেবলমাত্র পিয়ারার বিনিময়ে আরাকান-রাজ সুজাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। পিয়ারা তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে অনেকক্ষণ সুজার সঙ্গে রসিকতা করলেন। পিয়ারা তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে অনেকক্ষণ সুজার সঙ্গে রসিকতা করলেন। কিন্তু তারপরে স্থির করলেন আরাকান রাযার প্রতি ঘৃণ্য প্রস্তাবের সমুচিত শাস্তি তাঁকে দেবেন। তিনি সুজাকে বললেন, এই চল্লিশজন সৈন্য নিয়েই তাঁরা আরাকান রাজাকে আক্রমণ করবেন, বীরের

মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বির্সজন দিতে তাঁরা প্রস্তুত। কিন্তু এই ঘৃণ্য প্রস্তাব কখনও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

পিয়ারার কথা সুজার মনঃপুত হলো। জীবনের শেষরাত্রিকে মধুময় করে তোলার জন্য তিনি পিয়ারাকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। সুজা তাঁর অশ্বারোহীদের জানিয়ে আসতে গেলেন যে, সারারাত তিনি ঘুমাবেন না। পিয়ারার স্বঃগত উক্তিতে জানা গেল, এই শেষ মিলন রাত্রিকে তাঁরা আনন্দময় করে তুলবেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান – আগ্রার সাজাহানের প্রাসাদকক্ষ। কাল – রাত্রি।

এই দৃশ্যের শুরুতেই দেখা গেল, বাইরে প্রচণ্ড বেগে ঝড়বৃষ্টি চলেছে, ঘরের মধ্যে উন্মত্ত সাজাহান নিজের খেয়াল-খুশিতে অসংলগ্ন কথা বলে চলেছেন। জহরৎ তাঁকে শান্ত করতে ব্যস্ত। রাত্রি গভীর অথচ সাজাহানের চোখে ঘুম নেই। জহরৎ ও সাজাহানের কথার মধ্যে জাহানারা প্রবেশ করলেন। পিতৃহারা কন্যা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে – এই দেখে জাহানারার মন বেদনায় ভরে গেল। সাজাহানের উন্মত্ততা ক্রমেই বেড়ে চললো। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তান্ডব চলছে। সাজাহান উন্মত্তের মতো কখনও ঔরংজীব, কখনোও প্রজাপুঞ্জ, কখনোও বা সমগ্র পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্ছেন। জাহানারা ও জহরৎ উভয় মিলে সাজাহানকে সুস্থ করার চেষ্টা করছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান- গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল- প্রভাত।

গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী সোলেমান ও মহম্মদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এ দৃশ্যের শুরু হলো। তাদের কথা জানা গেল, ঔরংজীবের বিচারে মোরাদেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। এবং সুজা সপরিবারে আরাকানে নিহত হয়েছেন এঁদের কথার মাঝে দূরে সিপার দাঁড়িয়েছিলেন। পিতৃমাতৃহীন সিপারের দুঃখ সহ্য করা অসম্ভব। সোলেমান একবার সিপারকে কাছে ডাকলেন। সিপার সোলেমানের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গেলো। ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদকে আলিঙ্গন করলেন। এমন সময় দেখা গেল, মোরাদকে প্রহরীরা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। মোরাদ স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে

মৃত্যুদণ্ডকে মাথা পেতে নিয়েছেন। কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁর অভিযোগ একই পাপের দুই বিচার কেন? ঔরংজীব মোরাদের চেয়েও অপরাধী তার শাস্তি হয় না কেন? এমন সময় নেপথ্য থেকে মহম্মদের স্ত্রী বললেন – কেউ বাদ যাবে না। তারও শাস্তি আসছে। মহম্মদ একদৃষ্টে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, পৃথিবীর বাইরে নরকের কল্পনা অবিশ্বাস্য। পৃথিবীতেই যে নরক রয়েছে, তার পরে নরকের কল্পনা আর অসম্ভব নয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান- ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল- দ্বিপ্রহর রাত্রি।

ঔরংজীব একাকী ঘরের মধ্যে উন্মত্তের মতো কথা বলে চলেছেন। চারিদিকে যেন তিনি বিভীষিকা দেখছেন। দারার ছিন্নশির, সুজার রক্তাক্ত দেহ, মোরাদের কবন্ধ সকলেই যেন এক সাথে ঔরংজীবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় দিলদার প্রবেশ করলেন। ঔরংজীবের এই অনুতাপ দেখে দিলদার বললেন, এ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। শত হলেও ঔরংজীবও মানুষ। যতই পরকে তিনি ছলনা দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রাখুন না কেন – নিজের কাছে নিজের কাজের কি কৈফিয়ৎ দেবেন? অনুতাপ যে তখন আসবেই। দিলদারের কথায় ঔরংজীব ক্রুদ্ধ হয়ে দিলদারকে স্থান ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। দিলদার এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি এশিয়ার বিজ্ঞতম মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ। রাজনৈতিক অভিহহতা লাভের জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ তিনি দিল্লী ত্যাগ করলেন, সে অভিজ্ঞতা লাভ না করলেই ভালো হতো। ঔরংজীবকে চোখে আঙুল দিয়ে তাঁর ভুল সম্পর্কে সচেতন করে দিলদার বিদায় গ্রহণ করলেন। ঔরংজীব বিপরীত দিকে প্রস্থান করলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান- আগ্রার প্রসাদ-অলিন্দ। কাল – অপরাহ্ণ।

জহৎউন্নিসা ও জাহানারার কথার মধ্যে এ দৃশ্যের শুরু। তাদের মধ্যে ঔরংজীবের কথাই আলোচিত হচ্ছিল, ঔরংজীব যে কতদূর শঠ – সে কথা তাদের আলোচনার মধ্যে জানা গেল। এমন সময় সাজাহান নানা মণিমুক্তা দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে উপস্থিত হলেন। উন্মত্ত সাজাহানের ভয় – পাছে ঔরংজীব এও কেড়ে নিয়ে খায়। সাজাহানের এই উন্মত্ততা দেখে জহরৎ চোখে আঁচল দিয়ে প্রস্থান করলো। স্বাভাবিক জ্ঞান মাঝে মাঝে সাজাহানের ফিরে আসছে – তাঁর কথা দেখে বোঝা গেল। সাজাহান বলছেন – 'এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য...দারা, সুজা, মোরাদ সবাইকে মারলে...' এই সময় ঔরংজীব প্রবেশ করলেন। ঔরংজীবকে দেখে জাহানারা তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, পিতৃহত্যাটুকু বাকি আছে বোধহয়, সেই কার্যটুকু বোধহয় সমাধা করতে এসেছেন। সহসা সকলকে চমকিত করে দিয়ে ঔরংজীব বলেন, তিনি সাজাহানের কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। নিজের পাপের কথা স্মরণ করে তিনি সত্যিই অনুতপ্ত। তাই পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। জাহানারা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, এ ঔরংজীবের নতুন অভিনয় মাত্র। কিন্তু তাঁর পরই দেখা গেল ঔরংজীব নিজের রাজমুকুট সাজাহানের পায়ে তলায় রেখে পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইছেন। মুহূর্তে সাজাহান তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে মার্জনা করলেন। দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা করায় জাহানারা বিস্মিত হলেন। কিন্তু সাজাহান তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন ঔরংজীবকে ক্ষমা করার জন্য। অবশেষে জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে জাহানারাও ঔরংজীবকে ক্ষমা করলেন।

এমন সময়ে অকস্মাৎ জহরৎউন্নিসা বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, সমস্ত পৃথিবীও যদি ঔরংজীবকে ক্ষমা করেনও তিনি তাঁর পিতার হন্তাকারীকে কখনও এ জীবনে ক্ষমা করতে পারবেন না। বরং তিনি আরও বেশি করে নিজের বললেন, এই রাজ্যের ভারে ঔরেংজেব যেন দীর্ঘ জীবনের অংশী হয় ও শেষ বয়সে

যেন কারো কাছে নূনতম একবিন্দু করুণা থেকেও সে যেন বঞ্চিত হয়। জহরৎউন্নিসার এই উক্তির ভিতর দিয়ে দৃশ্যের তথা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

৪.২ অনুশীলনী

১) দৃশ্য অনুসারে সাজাহান চরিত্রের বির্বতন আলোচনা কর।

২) ঘটনা-পরম্পরা কি আদৌ যুক্তগ্রাহ্য? তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৩) আধুনিক নাট্যরচনায় সংস্কৃত অঙ্করীতির গতানুগতিকতা কি বিবরণে কোন ভাবে প্রভাব ফেলেছে? মতামত দাও।

৪.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

২) কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ,প্যাপিরাস।

৩) দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি।

৪) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৪.৪ উপসংহার

শেষ কথা হিসেবে বলা যায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন জনদরদি ও জনগণমনের কেন্দ্রবিদু হয়ে স্মরণীয় থাকবেন তার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, তিনি একজন প্রভাবশালী ও মঞ্চসফল নাট্যকার হিসেবে ধরা দিয়েছেন, বরং তাঁর কৃতিত্ব সর্বৈবভাবে সকল অনুভবের হৃদয়ের অনুগাহী হিসেবে ধরা দিয়েছে সেই কারণে। পারিবারিক দৃষ্টিকোণ যেমন সেখানে ধরা থাকে, ঐতিহাসিক অভিনিবেশও অধরা থাকে না, সমাজবোধ ও মানবমূল্যায়ণের অনুক্ষণ প্রত্যয় একেবারে সচেতন পাঠকের মতোই তিনি চিত্রিত করেন। এই নৈপুণ্যতা ও কিছু কাব্যিক সীমাবদ্ধতা নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল

আমাদের সামনে ধরা দেন। হ্যাঁ সেই সীমাবদ্ধতা কথা মাথায় রেখেই তিনি সেই সময়ের এক নাট্যমঞ্চের সারাজাগানো নাট্যপ্রদর্শন করে ফেলেন, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা মতো গণসংগীত কোথায় আপামর বাঙালীর মর্মবেদনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় একমাত্র তাঁরই প্রয়াসে। দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র বিতর্ক এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়, যার আলোচনা বাংলা সাহিত্যের টেক্স ভিত্তিক পড়াশুনাকেও কোথায় নাড়িয়ে দিয়ে যায়। হাসির গানের রস উদ্বেলতার পাশাপাশি আমাদের কবিমনের মর্মবেদনা ভাবিয়ে তোলে বারেবারে নতুনভাবে তাঁর কাব্যিক মানসিকতাকে আরও একবার পড়ে নিতে। মিলিয়ে নিতে কবিনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে।

একক ৫-বাংলা নাটকের সূচনা ও মধুসূদন

বিন্যাসক্রম

৫.১ বাংলা নাটকের সূচনা

৫.২ বাংলা নাটকের আদি যুগ ও মধুসূদন

৫.৩ নাট্যমঞ্চ ও মধুসূদন

৫.৪ মধুসূদনের নাট্যাদর্শ

৫.৫ ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক

৫.৬ অনুশীলনী

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি।

৫.১ বাংলা নাটকের সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা নাটকের প্রকাশ। বিস্ময়কর হতে পারে, আকস্মিকভাবে যেন হঠাৎ নাটক লেখা শুরু হল। তাঁর আগেই বা নাটক লেখা হয় নি কেন, সে দিনই বা হঠাৎ লেখা হল কেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মনে দেখা দেয়। বাংলাদেশে আধুনিক ধারায় নাটকের জন্ম হল বটে,ও চারশো বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে আছে যাকে আমরা বলি নাটগীত, যাত্রাপালা। প্রধানত সঙ্গীতের সাহায্যে, ক্ষীণ একটি কাহিনি সূত্র কে আশ্রয় করে এই পূর্বতন ধারা বহুদিন ধরে রচিত হয়ে এসেছে। কখনও তা কলমের ডগায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই জিহবার অগ্রে অবস্থান করেছে। আধুনিক দর্শক বা শ্রোতার কাছে, যাত্রা হয়তো স্থূল রুচির। শিথিল-গঠন, ভক্তিভাব বা রতিভাবের প্রাবল্যে প্রীতিকর নয় – তবু আধুনিক বাংলা নাটকে তাঁর প্রভাব আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়।

বরং বাংলা নাটকের মধ্যযুগে (১৮৭২-১৯১২) যাত্রার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। যাত্রার আগেও ছিল আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষায় লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক, যার নাটকের আধুনিক নাটকের ঘটনার দ্রুততা, আন্তরিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা, সর্বদা পাওয়া না গেলেও কাব্য হিসেবে যা আজও আমাদের আনন্দ দেয়। বাংলা নাটকের আদি যুগে, সংস্কৃত নাটকের প্রভাব প্রভূত পরিমানে পড়েছিল তাঁর উপর। বিশেষ করে নাটকের প্রস্তাবনা অংশে ও নাটকের শুভ সূচক পরিণতি রচনায় এই প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেই বাংলা দেশের নাট্যকারেরা একদা নাট্যপ্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অধিকাংশ বাঙালী নাট্যকারেরা ধ্রুব বলে মেনেছেন। বিদূষক চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপ ব্যবহারে শ্রেণী বিশেষের স্বাতন্ত্র্যধর্মে (পুরুষ এবং নারী বা সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার পার্থক্যে), নায়ক-নায়িকার আলংকারিক রূপ বর্ণনায়, - সংস্কৃত নাটকের বাংলা নাটকের একটা প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত G. C. Gupta রচিত ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকে ‘নান্দী’ এবং ‘নান্দ্যন্তে সূত্রধার’ আছে।) যদিও বাংলা নাটকের বিকাশধারা ক্রমশই সংস্কৃত নাট্যধারা থেকে দূরে সরে এসেছে, তবুও বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে উভয়ের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ বিস্মৃত হবার নয়।

সব শেষে বলব, ইংরেজি নাটকের প্রভাবের কথা, সন্দেহ নাই আধুনিক বাংলা নাটক, উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে যার জন্ম, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল প্রতীচ্য নাট্যসাহিত্য। হিন্দু-কলেজের ইউরোপীয় অধ্যাপকের কাছে যারা এলিজাভেথান যুগের নাটক অধ্যয়ন করেছিলেন, তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ক্রমশই শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যারা নিজেরা ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তাঁরাও শেক্সপীয়রের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন ও তাঁর সৌন্দর্য ও প্রাণময়তা অনুভব করলেন। প্রথম যুগে বাংলা নাটক যারা রচনা করলেন, তাঁরা অনেকেই এলিজাভেথান নাটককে আদর্শ রূপে গ্রহণ করলেন, পুরাণের কাহিনিকে আশ্রয় করেও পুরাণের ভক্তি রস নয়, ইউরোপীয় নাটকের মানব-রসই তাঁরা পরিবেশন করলেন নাটকের মধ্যে।

‘কীর্তিবিলাস’ নাটকের ভূমিকায় ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে নিজের আদর্শের কথা প্রমানিত করেছেন নাট্যকারঃ-

“অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাতে পারে যে, এই রূপ অভিনয় অবলোকন করলে অন্তে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কি রূপে মানবগণ স্বভাবত অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট পতিত হইবে যে, শোক জনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ শেক্সপীয়ারনামা ইংলন্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন – আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী’ কীর্তিবিলাস নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচকদের সুচিন্তিত অভিমত – নাটকটিতে শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুকরণ প্রচেষ্টা আছে। নায়ক কীর্তিবিলাসের আচরণ হ্যামলেটের মতো। ‘কীতিবিলাস’ এর সঙ্গে একই বছর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন নাটক। নাটকের বিষয় মহাভারত থেকে আহৃত, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের মতো নান্দী বা প্রস্তাবনা এবং বিদূষক চরিত্র এখানে নেই। ইংরেজি রীতি অনুসারে অঙ্ক বিভাজিত হয়েছে কতকগুলি দৃশ্যে যাকে সংযোগস্থল নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইংরেজি নাটকের প্রোলোগের মতো নাটকের একটি ‘অভ্যাস’ অংশ আছে।”

বাংলা নাটকরচনার আদি যুগে প্রধানত কয়েক ধরনের নাটক রচিত হতে থাকে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা ভাবালম্বনে লেখা নাটক – বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের প্রবোধচন্দ্রোদয় (১২৪৬ সাল); রামনারায়ণ তর্করত্নের বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী(১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), মালতীমাধব (১৮৬৭), নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৫৫), কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭), মালতীমাধব (১৮৫৯), শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মালবিকাগ্নিমিত্র (১২৬৬ সাল), গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিক্রমোর্বশী (১২৭৫ সালে) প্রভৃতি। ইংরাজি নাটকের অনুবাদ বা ভাবালম্বনের লেখা নাটক – হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাসঃমার্চেন্ট অফ ভানিস(১৮৫৩); চারুমুখ চিত্তহরাঃ রোমিও জুলিয়েট(১৮৬৪); শ্যামাচরণ দাস দত্তের অনুতাপ নবকামিনীঃ রো-রে দি ফেয়ার পেনিটেন্ট(১২৬৩ সাল); সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুশীলা-বীরসিংহঃ

সীম্বীলিন(১৮৬৭); চন্দ্রকালী ঘোষের কুসুমকুমারী নাটকঃ সিম্বেলিন (১৮৬৮) প্রভৃতি। পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে লেখা নাটক – তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২); হরচন্দ্র ঘোষের কৌরববিয়োগ(১৮৫৮); রামনারায়ণের রুক্মিণীহরণ(১৮৭১); কংসবধ(১৮৭৫); ধর্মবিজয়(১৮৭৫); উমেশচন্দ্র মিত্রের সীতার বনবাস(১২৭২ সাল); কালীপ্রসন্ন সিংহের সাবিত্রী সত্যবান(১৮৫৮) প্রভৃতি। রোমান্স বা কাল্পনিক আখ্যানাবলম্বনে লেখা নাটক জি. সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস(১৮৫২); রামনারায়ণের স্বপ্নধন(১৮৭২) প্রভৃতি। এবং সামাজিক নাটক ও প্রহসন – রামনারায়ণের পতিব্রতোপাখ্যান(১৮৫৩), কুলীন কুলসর্বস্ব(১৮৫৪), নবনাটক(১৮৬৬), যেমন কর্ম তেমনি ফল(১৮৬৫), উভয় সঙ্কট(১৯৬৯), চক্ষুদান(১৮৬৯), অজ্ঞাত নাট্যকারের সম্বন্ধসমাধি নাটক(১৮৬৭), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিবাহ নাটক, শ্যামাচরণ শেঈমানীর বাল্যাদ্বাহ নাটক(১৮৬০); অম্বিকাচরণ বসুর কুলীন কায়স্থ নাটক(১৮৬১); নফরচন্দ্র পালের কন্যাবিক্রয় নাটক(১৮৬৩); তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক(১৮৫৮), উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক(১৮৬৫); শিমূলের পিরবক্সের বিধবাবিবাহ নাটক(১৮৬০) প্রভৃতি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ বলতে ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ (ন্যশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা) পর্যন্ত ধরা হয়। বলাবাহুল্য উপরের তালিকায় এমন অনেকগুলি নাটক উল্লিখিত হয়েছে যেগুলি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত, কিন্তু মোটের উপর নাটকগুলির রচয়িতাদের মানসিকতার মানসপ্রবণতা আদিযুগের বাংলা নাটকের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। অবশ্য এখানে ‘আদি যুগ’ কথাটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের প্রসঙ্গে ব্যবহার না করে ‘প্রাক্ মধুসূদন যুগের বাংলা নাটকে’র পরিস্থিতি বোঝাতে প্রয়োগ করা ভালো। অথবা বলা যেতে পারে ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ এর সময় পরিধির মধ্যে থেকে বাংলা নাটক তাঁর অনুকরণ ও নির্মাণের পর্যায়ে থেকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধনে এক নবসৃষ্টির পথে এগোচ্ছিল।

৫.২ বাংলা নাটকের আদি যুগ ও মধুসূদন

মধুসূদন নাটক লেখায় হাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা আদর্শ লাভ করে নি। ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বা বিকৃত; বাংলা গদ্যের অপরিণত অবস্থা ও তাঁর ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাটককে দুর্বল করেছে। পৌরাণিক নাটকগুলিতে পুরাণের মতো আখ্যায়িকা বা বিবৃতি ছিল, কিন্তু কোনো নাট্যধর্ম ছিল না। শুধুমাত্র সংলাপে স্থানে-অস্থানে সংগীতের ব্যবহারই এঁদের নাটক নামে পরিচিত করে ছিল। সমাজ-সমস্যামূলক নাটক ও প্রহসন তুলনামূলক ভাবে প্রাণ স্পন্দন পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে গঠন শীথিলতার চিহ্ন ছিল অতি প্রকট; তাই সেগুলিকে সামাজিক নাটক না বলে সমাজ চিত্র বলাই সংগত। সমাজ জীবনের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যপটকে নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ববস্তুর অনুসরণে সেই দৃশ্যগুলিকে সংযুক্ত করা হয়নি। গ্রাম্যতা ও রুচিবিকারও এই রচনাগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদা লাভে বাধা দিয়েছে। মাইকেল মধুসূদন তাঁর প্রথম নাটক – 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় সে সময়ের নাট্যসাহিত্যের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেনঃ –

'মরি হায় কোথা সে সুখের সময়।
যে সময় দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত-ভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিৎ না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কূনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,

তাহে হয় তনুঃ মন ক্ষয়।

মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,

সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়'

মধূসূদন সগর্বে বলেছিলেন যে, আমি এমন গ্রন্থ রচনা করিব যে, প্রাচীন সম্প্রদায় পন্ডিতগণ দেখিইয়া বিস্মিত হইবেন। বাস্তবিক ও তাঁহার গর্ব বাক্য সফল হইয়াছিলেন। তাঁহার সমকালীন নব্য সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ একবাক্যে শর্মিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন।' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত)

মধুসূদন প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। অল্প যে কয় বৎসর তিনি সাহিত্যসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তারই মধ্যে নাটকে মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে – সর্বক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করতে তিনি সক্ষম হন। দ্রুত একটা পরিবর্তন তিনি চেয়েছিলেন; তাঁর নিজের হাতেও সময় বেশি ছিল না। দ্রুতই বাংলাসাহিত্যের পট পরিবর্তিত হল – মধুসূদন এক হাতে ভাঙলেন, অন্যহাতে গড়লেন। বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের সংকীর্ণ গন্ডি থেকে বেরিয়ে এল, বিশ্ব সাহিত্যের সংগামী হয়ে – মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের সূচনা হল। জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টি, সাহিত্যের রূপ ও রীতি, সর্বপরি প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রকাশে মধুসূদন যুগস্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

দ্বৈত ভূমিকায় ইংরেজ আমাদের দেশে উপস্থিত হয়েছিল – একদিকে শাসক ও শোষকের মূর্তিতে অন্যদিকে বর্হিজগতের চিত্রদূত রূপে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে চিত্রদূত রূপেই ইংরেজকে ভারতবাসী গ্রহণ করেছিল, বিশেষ করে বাঙালী। মধ্যযুগের কুসংস্কার, জড়তা, আলস্য থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল বাঙালীসমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দিতেই যুগ পরিবর্তন আসন্ন হয়েছিল। ইংরেজের আগমন সেই পরিবর্তনকে দ্রুততর করল। সামনে আরও আছে – 'ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রেরণা বাঙ্গালীকেও এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যদিও উনবিংশ শতাব্দির বাংলাদেশের জাগরণকে কোনো অর্থেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে একনামে অভিহিত করা যায় না – তবু উনবিংশ শতাব্দিতে আমাদের দেশে সুপ্তির আংশিক অবসান ঘটেছিল, একথা স্বীকার

করে নিতেই হবে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটোলো – ইংরেজ মধ্যস্থতা করল মাত্র। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক সবই নতুন সৃষ্টি। ভক্তির কুয়াশাময় মুক্তির আলোকে জগতকে প্রত্যক্ষ করা – দেবত্বের শান্ত মহিমায় নয়, সংরাগের তীব্র যন্ত্রণায় আত্মপ্রকাশ, - আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হল। মধ্যযুগের মতো, 'ম্যান দি কম্যিউনিটি' নয়, আধুনিক যুগে 'ম্যান দি ইন্ডিভীজুয়ালের' প্রকাশ। এই নব মানবতাবাদকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন মধুসূদন দও।

মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত; ইউরোপীয় আরও কয়েকটি প্রাচীন ভাষায় পারদর্শি। মাদ্রাযায় থাকার সময়েই তিনি সংস্কৃত ভাষা যথেষ্ঠ অর্জন করেন। (মধুসূসন এর পত্রঃ- 'Here is my routine – 6/8 Hebrew'8/12 School; 12/2 Greek; 2/5 Telegu & Sanskrit; 5/7 Latin; 7/10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?') বলা বাহুল্য মধুসূদনের সাহিত্য কর্মে এই বিশ্ব সাহিত্য পরিক্রমা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই যুগে এই বিশ্বনাগরিকতা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে বিরল দৃষ্ট ঘটনা ।

মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা(১৮৫৯)। শর্মিষ্ঠা নাটকের বিষয় নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে। মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। বিষয়ানুসারী শ্রেণি নির্দেশে 'শমিষ্ঠাকে' তাই পৌরাণিক নাটক নামে অভিহিত করতেই হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা যাকে পৌরাণিক নাটক বলি, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক যার দৃষ্টান্ত, তাঁর সঙ্গে 'শমিষ্ঠা' নাটকের পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় পুরাণ বা মিথ এবং ভারতবর্ষীয় পুরাণ – স্বতন্ত্র উৎসজাত ও তাদের আবেদন ও পৃথক। গ্রীস দেশে যে সব দেব দেবী বা পৌরাণিক চরিত্র সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে মর্ত্যের মানবের ভক্তির সম্পর্ক নেই। গ্রীক জীবনাদর্শের মধ্যে একটা সুস্থ সবল জীবন উপভোগের পরিচয় পাই। এরা দেবদেবী হয়েও স্বর্গে এঁদের বাস হওয়া সত্ত্বেও মানবিক গুণে বঞ্চিত নন। এরা ইউরোপীয় সাহিত্য - পাঠকের মনে ভক্তি ভাব জাগরুক করেন না। অন্যদিকে আমাদের দেশে পুরাণ প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস ও

আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। অবশ্য মহাভারতের সকল চিত্র ও চরিত্রের ধর্মীয় ব্যাখ্যা না দিলেও চলে যেমন শকুন্তলা উপাখ্যান অথবা যজাতি শর্মিষ্ঠা দেবযানী উপাখ্যান।

ধর্মভাবমুখ্য পৌরাণিক নাটকের জন্ম হল – মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরবর্তী যুগে। অবশ্য যাত্রা অভিনয়ের মধ্যে ভক্তি ভাব পরিবেশনের প্রয়াস আগেও ছিল। পরবর্তীকালে সেই ধারারই অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখলেন মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ।

'শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনি পুরাণ থেকে নেওয়া হলেও হিন্দুপুরাণের প্রাণ(স্পিরিট) তাঁর মধ্যে নেই। এ যেন হিন্দুপুরাণের আধারে গ্রীক পুরাণের প্রাণ পরিবেশিত। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, সে কথা শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গেও স্মরণ করতে পারি 'I Shall not borrow Greek stories, write, rather try to write as a Greek would have done." গ্রীক সাহিত্যের প্রধান যে চারটি লক্ষণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে যথা অখণ্ড সৌন্দর্য বোধ, পূর্ব সংস্কার মুক্তি, মানব রস ও ঋজু জীবন দৃষ্টি, - শর্মিষ্ঠা নাটকে তা দুর্লক্ষ্য নয়।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দির দর্শকেরা শর্মিষ্ঠা নাটকের মধ্যে প্রধানত তত্ত্ব ও উপদেশ অন্বেষণ করেছিলেন, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা, শমিষ্ঠা নাটকের অভিনয় সমালোচনা কালে মন্তব্য করেছিলেনঃ- "The drama is based on a classic story of the Mahabharata, illustrating with great effect to very interesting moral of human right' September 10, 1859." বলা বাহুল্য, তত্ত্বের উৎকর্ষই সে যুগের সাহিত্য কর্ম বিচারের প্রধান মানদণ্ড ছিল, এবং সেই দিক দিয়েই মধুসূদনের কাব্য নাটক প্রশংসা বা নিন্দা অর্জন করেছে।

শর্মিষ্ঠার পরবর্তী 'পদ্মাবতী' নাটকের(১৮৬০) শুধু প্রাণ প্রেরণা নয়, আখ্যান অংশটুকুও গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া। 'পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো ভিনস্, ডিস্ করডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হয়েছে। মধুসূদন রাজনারায়ন বসুকে লিখেছেন – "I am sure, I need not tell you that in the first act you have the greek

story of the golden apple Indianised.'' প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ইউরিপিদিসের (ট্রোজান উওম্যান) নাটকের পরোক্ষ প্রভাব পদ্মাবতী নাটকে পড়েছে। 'পদ্মাবতী নাটকে দেবদেবী ও মানবমানবী – দু'শ্রেণী চরিত্র আছে কিন্তু সেই দেবদেবীকে ভারতীয় অভিধা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের গ্রীক পরিচয় কোথাও অপ্রকট নয়, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে নাটকটির পরিণতি মিলনান্ত – মুরজা পরাজিতা, কিন্তু ইন্দ্রনীল্কে শাস্তি দিতে গিতেই হারানো মেয়েকে সে খুঁজে পেয়েছে। শশাঙ্কমোহন সেনের মতে 'পদ্মাবতী নাটকে কবি যেই কলাশক্তি এবং গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বলিতে ইহবে তাঁহার তুলনা কবির অন্য কোন নাটকে নাই' বলা বাহুল্য এ বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। ঘটনা গ্রন্থনে অসংগতি আছে। যেখানে মধুসূদনের মৌলিক কল্পনার প্রকাশ, সেখানেই সবচেয়ে দুর্বলতা। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, পদ্মাবতী নাটক পরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটকের আদর্শ গৃহিত হয়েছে। সংলাপ রচনায় পরিচিত সংস্কৃত নাটকে – শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী ছত্র বিশেষের অনুদিত রূপ দেখলেই তাঁকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বলা উচিৎ নয়। তবে মধুসূদন চেয়েছিলেন গ্রীক পুরাণের গল্পকে যতদূর সাধ্য তাঁকে ভারতীয় রূপ প্রদান করতে। অবশ্যই এই প্রয়াসকে ঠিক সমন্বয়ের চেষ্টা বলা যায় না। গ্রীক নাট্যের প্রাণ যদি রক্ষা করতেই হয়, তাহলে তাঁকে বিয়োগান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারতীয় নাটকের প্রথাবদ্ধতায় ক্লান্ত দর্শক নূতন কিছু একটা চাইছে – কিন্তু বিয়োগান্ত নাটককে গ্রহণ করতেও তখনও দর্শক প্রস্তুত নয়। দেবীদের বিরোধ নাট্যাভীপ্সিত তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনির অনুবর্তনে শচী চরিত্রের রূপান্তর অসম্ভব। অন্যদিকে বিদূষককেও বাদ দিতে পারছেন না মধুসূদন, রত্নাবলী ও শমিষ্ঠার জনপ্রিয়তা তাঁর মনে কাজ করছে। এ অবস্থায় সাময়িক একটা আপস মীমাংসা হিসেবে কিছু বিদেশী কিছু স্বদেশী, ইউরিপিদিস ও কালিদাসের সমন্বয় সাধনে সফল হননি মধুসূদন কিন্তু একে মহৎ ব্যর্থতা বলতে পারি, কেননা উনবিংশ শতকের পাঠক- দর্শক সমাজ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তেমনি জিনিস পরিবেশন করা মধুসূদনের মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন বিপ্লবী, সেখানে তিনি নিজেই নিজের আদর্শ স্থাপন

করেছেন, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য 'To have it acted' এবং সেক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

'শমিষ্ঠা' নাটক শেষ করেই মধুসূদন দুটি প্রহসন লেখেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০), বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ(১৮৬০)। প্রথমটিতে নব্য যুব সম্প্রদায়ের ইয়ং বেঙ্গলের বিকৃত সংস্করণ, অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ও দ্বিতীয়টি ধনপতিদের ধনচর্চা ও কামচর্চার কুরুচিকর দিকটি চিত্রিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট স্যাটায়ারের নির্দশন এই প্রথম পেলাম। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের নাটকের প্রশংসা করতে না পারলেও প্রহসন দুটি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন 'এ পর্যন্ত কোনো বাঙালী নাটক প্রণয়ণে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই...তাহার চেয়ে মধুসূদনের প্রহসনগুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিজগুণ প্রাচুর্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।'

প্রহসন দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল – সংস্কারের ইচ্ছা ও সমালোচনার তীব্রতা একই সঙ্গে এদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটির মধ্যে প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্টতর মনে হয়। তবে সে যুগে প্রথমটি অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা'র যে দীর্ঘ সমালোচনা বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশ করেন তাঁর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করি – 'অধুনা নাটকের সম্মক সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ; অতএব বর্তমানের কু-প্রবৃত্তি সকল নাটক দ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত একেই কি বলে সভ্যতা নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য নববাবুদিগের পানাসক্তিনিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্ট রূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনায় দত্ত বাবুর যাহা কিছু ক্ষমতা যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উপস্থিত প্রহসনে সর্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে। অধুনা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, নাটক রচনায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন। মানুষের যর্থাথ প্রকৃতির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল

বাক্যে তাঁহার উদ্ভাসন যে কবির প্রকৃত ধর্ম ও বীণাপাণির মুখ্য প্রসাদ তাহা দত্তজর উপলব্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি ত্বরায় বঙ্গীয় একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইবেন – এমত সম্ভাবনা হইয়াছে; আমরা ভরসা করি দত্তজ এই অবকাশ বৃথা নিক্ষেপ করিবেন না। ইয়ংবেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদেঘাষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তদসমুদায় আমাদিগের জানিত কোনো না কোনো নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।'

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রেরণা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আক্রমণের তীব্রতাও প্রবল। প্রথম থেকেই নব্যযুবকদের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তাতে কিছু বেশি রঙ চড়ানো হয়েছে – চমৎকারিত্ব, সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসও লক্ষ করি। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' তে চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব রক্ষায় ও ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের মিশ্রণে । প্রহসন হিসেবে তাঁর সার্থকতা প্রদর্শিত হয়েছে।

এর পরেই মধুসূদন রচনা করেন কৃষ্ণকুমারী নাটক(১৮৬১), ঐতিহাসিক নাটক রূপে, ট্র্যাজেডি রূপে নাটকের সুপরিকল্পিত গঠন সংলাপ রচনার আংশিক সাফল্যে – কৃষ্ণকুমারী নাটক আদি যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মধুসূদনের শেষ নাটক মায়াকানন(১৮৭৪) তাঁর জীবিত কালে মুদ্রিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। মায়াকানন যখন লিখছেন তখন মধুসূদন রোগ শয্যায়। সমালোচকের মতে 'মধুসূদনের শেষ জীবনের অনির্বাণ আত্মগ্লানি বহ্নির শুদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়ায় মায়াকাননের প্রধান ভূমিকাটি প্রনিধানযোগ্য... মায়াকাননের ট্র্যাজেডি নিষ্করুণ, শোকাবহ এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন এখানে ও নায়ক নায়িকার সব আশা ভরসা নিঃশেষে চুকিয়া গিয়ে তবে যবনিকা পতন হইয়াছে।' মায়াকানন নাটকের আখ্যান কাল্পনিক। তবে তাঁর ঘটনাবস্তুকে পৌরাণিক যুগের পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে। গ্রীক পুরাণের কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে মায়াকাননের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অজয় চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের একাত্মতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৫.৩ নাট্যমঞ্চ ও মদুসূদন

নাটক লেখা হয় মুখ্যতঃ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। সাহিত্য বা কাব্য হিসেবে তাঁর অন্যতর আবেদন থাকতে পারে, - কিন্তু মঞ্চ ও দর্শকের প্রয়োজনেই নাটকের সৃষ্টি। বাংলাদেশে অতি আধুনিককালে নাটকের জন্ম। ফলে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসও সুপ্রাচীন নয়। অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে যে নাটকটিকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়, তাঁর প্রকাশের অর্ধশতাব্দির ও আগে বাংলাদেশে নাট্যমঞ্চের সৃষ্টি ও নাটক অভিনয়ের প্রচলন হয়েছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশীয় হেরাসিম লেবেদফ বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর লেবেদফের নবপ্রতিষ্ঠ থিয়েটারে 'দি ডিসগাইজ' নামে একটি নাটক অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই নাটকটির বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি, প্রকাশিত হলে একেই প্রথম বাংলা মঞ্চস্থ নাটক বলত হত। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী বাংলা নাটকের সঙ্গে লেবেদেফের অন্যান্য নাটকের যোগসূত্র বিশেষভাবে পর্যালোচনার বিষয়। অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন 'বাংলা নাটক ইংরেজি নাটকের দৃষ্টান্তে রচিত। লেবেদফ সর্বপ্রথম সেই দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বাংলা থিয়েটারের পত্তন করিতে উদ্যত হইয়া তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করার কথা এবং যাত্রার অনুকরণ করার কথা ভাবিলেন না। আসল কথা তিনি বুঝিয়া ছিলেন, বাংলা নাটক ইংরেজি নাটকের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে ইহবে। এখানে লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন নাটকের লেখকদ্বয়ও ইংরেজি নাটকের অনুকরণে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন।'

কিন্তু লেবেদফের ভারতবর্ষ ত্যাগের দীর্ঘকাল অনুরূপ কোনো প্রয়াস বাংলাদেশে দেখা যায় নি। অবশ্য যাত্রাভিনয় সেই যুগেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ প্রকৃতপক্ষে কবিওয়ালাদের যুগ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম বাঙালি প্রচালিত নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করলেন(২৮শে ডিসেম্বর ১৮৩১), - শেক্সপীয়র ও ভবভূতির নাটকের অনুবাদ এই মঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু অল্পদিন এর স্থায়িত্ব। তবে এই সময় থেকেই অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা বাঙালির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে – অনুবাদে নয়, বিশেষ করে বাংলা নাটকেরই অভিনয়।

এই দিক দিয়ে নবীনচন্দ্র বসু নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চটি (এই গৃহটি কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটের শেষের দিকে অবস্থিত ছিল। এখন যেখানে শ্যামবাযার ট্রাম ডিপো।) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি নাটক অভিনীত হয়। এই সময় থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা শেক্সপীয়রের নাটক কখনও ইংরেজিতে, কখনও বাংলায় ভাষান্তরিত করে অভিনয় করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ার একাডেমি (১৮৫১) ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থিয়েটারের (১৮৫৩) উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালের শিমলার আশুতোষ দেবের বাড়িতে একটি নাট্যমঞ্চে নন্দকুমার রায়ের অনুদিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে '১৮৫৭ সন হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্ন চলিয়া আসিয়াছে।' এরপর রামজয় বসাকের গৃহে 'কুলীন কূলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকটি এবং তাঁর অভিনয় উভয়ই সে যুগে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ এই যুগে অনুবাদ নাটক ও পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও তারই সৃষ্টি। এখানেই রামনারায়ণের অনূদিত 'বেণীসংহার'(১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্নের অনূদিত বিক্রমোর্বশী(১৮৫৭) অভিনীত হয়।

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রসরের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণের অনুদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় উপলক্ষেই মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে বাংলাদেশেও নাট্যমঞ্চের যোগাযোগ ঘটল। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকের 'রত্নবলী' নাটকের রসাস্বাদে সাহায্য করার জন্য নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করার প্রস্তাব উঠলে, মধুসূদন তাঁর অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 'অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতাদিগের প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন। তাঁহার কৃত অনুবাদ সকলেরই মনোনীত হইল। রাজারা নিজ ব্যায়ে তাহা মুদ্রিত করাইলেন এবং মধুসূদনকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচশত টাকা দিলেন।'

এই সময়েই ‘একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস(Rehersal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেনঃ ‘দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।’ গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, ‘নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে, আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়? মধুসূদন বলিলেন, ‘ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব’(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত) এরই ফলে ‘শর্মিষ্ঠা নাটক রচিত হল।’

৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের অভিনয় হয়। মধুসূদন নিজে নাটকের অভিনয় দর্শনে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেনঃ When Sharmista was acted at Belgachia the Impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings they were ‘things to dream of, not to tell’

যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন মধুসূদন কৌশোর থেকে, একবার যখন তার স্বাদ পেলেন(মধুসূদনের নিজের ভাষায় Now that I have got the taste of blood I am at it again. I am now writing another play) তখন আর একবার একটি নাটক রচনায় তিনি উদ্যোগী হলেন। সৃষ্টি হল, ‘পদ্মাবতী’। ‘পদ্মাবতী’ লেখা হয়েছিল একটি সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয়ের জন্য। কিন্তু তখনকার মতো তার কোনো অভিনয় হয়নি। অবশ্য বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের সঙ্গে মধুসূদনের তখনো যোগাযোগ ছিল। পাইকপাড়ার রাযাদের উতসাহে তিনি এবার দুটি প্রহসন রচনা করলেন, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’। কিন্তু প্রহসন দুটি নবীন ও প্রবীণ সমাজ-নেতাদের বিব্রত করল, আপাতত মঞ্চস্থও হল না। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, ’As a scribbler, I am of course proud to think that you

like my faces, but to tell you the candid truth, I half regret having published those things.'

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাকালে মধুসূদনের মনে ভয় ছিল, নতিন নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সুযোগ পাবে কিনা। তিনি বারবার বলেছেন 'Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at Belgachia, and Chota Rajah ought if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese'

বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়নি। নাটকটি রচিত হওয়ায় অব্যবহিত পরে ২৯ মার্চ ১৮৬১ তারিখে ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী শোভাবাযার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি প্রথম 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। যেমন সেই সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সূত্রধর হিসেবে ছিলেন বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু। ভীম সিংহ শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেন বাবু প্রিয়মাধব বসু মল্লিক প্রভৃতি।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় (সোমবার ১১ই ফ্রেরুয়ারী ১৮৬৭) কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয় তাঁর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেলঃ

শোভাবাযার নাট্যশালা – গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের সুনির্বাচিত দর্শকের সম্মুখে বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত সুপরিচিত বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখিয়ে সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মৌলিক নাটক...নাট্যমঞ্চে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলী ও অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিৎ। কোনো অভিজ্ঞশিক্ষা দাতার সাহায্য ব্যতিরেকে যা করা সম্ভব তা তাঁরা করেছেন। ... এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে যারা ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংগ , বলেন্দ্র ও সত্যদাস

চরিত্রের অভিনয় করেছিলেন, তাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করলে তাঁরা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এর অভিনয় হয়েছে। আরও পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ফ্রেব্রুয়ারী ন্যাশানাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (যদিও বিজ্ঞপ্তি লেখা হল By a Distinguished amateur')। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় পাই, 'ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবু রিহার্স্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ সহস্তে গিরিশবাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন।'

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে দেখি – "The week Saturday, 12th july. We are requested to announce that the managers of the National Theatre will give a performance at the Opera House on Wednesday next for the benefit of the Orphan children of the late Michael Madhusudan Dutta." মধুসূদনের সন্তানদের সাহায্যকল্পে কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মধুসূদনের বিশেষ যোগাযোগ ঘটেছিল। অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব, স্ত্রীলোক না নইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' মাইকেল ও শরৎবাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt. (উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।" এই বেঙ্গল থিয়েটারেই মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক অভিনয়কালে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। মধুসূদন তাঁর শেষ জীবনে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য আরও দুখানি নাটক লেখা শুরু করেন, 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধর্নুর্গুণ'। দ্বিতীয়টির রচনা সমাপ্ত হয়নি। মায়াকানন মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত (প্রথম অভিনয় ১৮ এপ্রিল, ১৮৭৪) হয়।

বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে আমৃত্যু মধুসূদনের যে যোগাযোগ তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা নাটক ও জাতীয় নাট্যমঞ্চের উন্নতি তাঁর অভিলষিত ছিল। মধুসূদনের সাহিত্যকৃতি আলোচনাকালে তাই ব্যপকতর একটি ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখা দরকার। গৌরদাস বসাক মধুসূদন সম্বন্ধীয় স্মৃতি রোমোন্থনে বাংলা নাট্যমঞ্চে ইতিহাস বিবৃত করেছেন, কারণ 'We would not had given it in this book if the name of Madhusudan Dutta were not intimately connected with the Bengali Drama, amd if he had not taken a prominent part in the promotion and success of the first Bengali Theatre, by composing plays for it as well as attending the performances, and making suggestions to the actors for their improvement'

৫.৪ মধুসূদনের নাট্যাদর্শ

মধুসূদনকে পথ তৈরি করে নিতে হয়েছে। এক নূতন জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন আমাদের। কৈশোরে তাঁর স্বপ্ন ছিল ইউরোপ যাবার, এবং সেখানে গিয়ে বিদেশী ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার। পরবর্তী জীবনে সে স্বপ্ন কিছু পরিবর্তিত হল, - ইউরোপ তিনি গেলেন ঠিকই, কিন্তু অমরতা লাভ করলেন মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অবশ্য ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা আদর্শ তাঁর সামনে সবসময়েই ছিল এবং নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি ভারতীয় প্রথাবদ্ধ লক্ষণকে অস্বীকার করেছেন।

নাটকের আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন শেক্সপীয়রের কাছ থেকে। গ্রীক নাটকও তাঁর নিশ্চয় পড়া ছিল, কিন্তু গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের সঙ্গে মধুসূদনের কোন পরিচয় ছিল না একথা ভাবা শক্ত। মধুসূদনের নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাব অন্বেষণ করে দেখা দরকার।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। মধুসূদন জানতেন যে, তাঁর লেখা নাটককে বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ শেক্সপীয়রের

নাটকের মানদন্ডে বিচার করে দেখবে, যদিও তা নিশ্চয় সর্বদা সঙ্গত নয়। তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছেন, 'I have certain dramatic notions of my own which I followed invariably. Some of my friends and I fancy you are among them as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare.'

মধুসূদুন নাটক রচনা আরম্ভ করার আগেই সংস্কৃত কয়েকটি নাটক পড়ে নিয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের পরিচালকদের কাছে ও বাঙালী দর্শকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে, সংস্কৃত নাটকের সব রীতিনীতি একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না – অন্তর বহিরঙ্গ কতকগুলি ব্যাপারে একটা লোকদেখানো সাদৃশ্যও থাকা চায়। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটকে সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু লক্ষণ সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। এই দুই নাটকই মিলনান্ত, দুটিতেই অতীত ভারতবর্ষের পৌরাণিক জগত, পটভূমি, বিদূষক চরিত্র, নাটকীয় প্রয়োজন ব্যতিরেকে সঙ্গীতের ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

পত্রে অবশ্য মধুসূদন সর্বদাই সরবে ঘোষণা করেছেন যে, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কোনো নির্দেশ তিনি মানবেন না। 'পদ্মাবতী' নাটক লেখার পর রাজনারায়ণকে লিখেছেন , -'If I should live to write other dramas, you may be rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dictum of Mr. Viswanath of the Sahityadarpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real national theatre."

ভারতীয় নাটক ও ইউরোপীয় নাটকের বৈসাদৃশ্য শুধু গঠনে নয়, মূলত তাদের প্রেরণায় পৃথক। শেক্সপীয়র যে অর্থে নাট্যকার, কালিদাস কে সে অর্থে নাট্যকার বলা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা, মিরন্দা, দেসদিমোনা' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে এই পার্থক্যটি নির্দেশ করেছেন। সংস্কৃত নাটকের ঘটনা বিরলতা, বর্ণনাতিশয্য, কাব্যধর্ম, দ্বন্দ্ব সংঘাতে তীব্রতার অভাব সহজেই চোখে পরে। এলিজাভেথীয় নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রবলতা,

ঘটনার গতিময়তা, চরিত্রের অন্তর্মুখীনতা, নাটকীয় উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ অনেক- তিনি চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় এলিজাভেথীয় আদর্শে নাটক রচনা করতে। তিনি পত্রে গৌরদাস বসাককে লিখেছেন –

"I am aware, my dear fellow that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama, but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing?... Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking, and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit"

কিন্তু মধুসূদন কি তা পেরেছিলেন? 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' – তে মধুসূদনের নিজস্ব নাট্যাদর্শ অনেক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি সংস্কৃত নাটকের 'শৃঙ্খল'

সম্পূর্ণ রূপে ছিড়তে পারেনি। আবার শর্মিষ্ঠা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন যখন সংশোধন করে দেন, তখনই তা মধুসূদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন,- কিন্তু সে শুধু কাব্যের গঠন এবং সংলাপ রচনার ভাষার ক্ষেত্রে। অবশ্য প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ শর্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তীব্র বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর কারণ সম্ভবত গ্রন্থারম্ভে নান্দী এবং নটী ও সূত্রধরদের ভূমিকা বর্জন করায়, এবং সংস্কৃত আলংকারিকদিগের মতে অঙ্কে গর্ভাংকে যেরূপ পার্থক্য থাকা কর্তব্য নাটকীয় পাত্রগণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যিক, তিনি সে বিষয়ে তাদৃশ্যি মনোযোগী হন নাই' বলে।

মধুসূদন নাটক লিখতেন মঞ্চের মুখ চেয়ে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন নাটক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হোক বা না হোক, মঞ্চস্থ তাঁকে হতেই হবে,- এবং সেখানেই তাঁর আসল পরীক্ষা। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রসঙ্গে লিখেছেন – 'I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted."

বলা বাহুল্য মঞ্চসাফল্যের জন্য শুধু নাট্যকারের নিজের রুচি নয়, দর্শকের তৃপ্তিবিধান করতে হয়। এইখানেই ছিল মধুসূদনের প্রকৃত আত্মসংকট, এবং নাটকরচনায় মধুসূদনের আপেক্ষিক ব্যর্থতার কারণও এরই মধ্যে নিহিত।

মধুসূদন চেয়েছিলেন দর্শকের রুচিকে উন্নততর করে তুলতে। যাত্রাভিনয়ে পরিতৃপ্তিলাভে অভ্যস্ত দর্শকের পক্ষে মধুসূদনের নাটকে রসাস্বাদ করা সহজ ছিল না। কিন্তু 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও একদিনের সমাদরলাভ করেনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এবং এলিজাভেথীয় নাটকের মতোই বাংলা নাটকও 'ব্ল্যাংক ভার্সে' লেখা হোক, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কাব্যের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করতে মধুসূদন সাহসী হলেও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি এর প্রয়োগ করলেন না। কারণ দর্শকের কান তখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর থেকেও বড়ো কারণ ছিল বোধহয় অভিনেতাদের অসামর্থ্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবৃত্তি ও কৌশল জানা না থাকলে তা কোনো আবেদনই সৃষ্ট করতে পারবে না।

মধুসূদন বাংলা ভাষাকে ভাবসামর্থ্যে উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের ভাষা প্রহসনের নয়, সর্বদা মুখের ভাষা নয় – বলা যেতে পারে, কিছুটা আলংকারিক ভাষা। কারণ মধুসূদন কখনো ভুলতে পারেননি যে আসলে তিনি কবি। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'দত্ত সাহেব যখনই নাটক লিখিতে বসেন তখনই তাঁহার অবিংসবাদিত কবি-প্রতিভা তাহাকে পরিত্যাগ করে।' কিন্তু মধুসূদন নিজে তাঁর নাটক সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন, 'The only fault found with it, is that language is a little to high for such audiences as we may expect now to

patronize it. This I need scarcely tell you, nothing; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, ... people talk of it's poetry with rapture."

এদিক দিয়ে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদবধ কাব্যের কবিভাষা শুধু তৎসম শব্দ বাহুল্যের জন্য নয়, তাঁর প্রয়োগ-রীতির বিশিষ্টতার জন্যই সে যুগে যতখানি চমক সৃষ্টি করেছিল ততখানি সুদূরবিস্তারী প্রভাব সঞ্চার করতে পারেনি। এই কবিভাষায় সে যুগে পন্ডিত সমাজে, এবং পরবর্তী যুগে অপন্ডিত সমাজে মেঘনাদ বধ কাব্যকে জনপ্রিয় হতে দেয়নি।

মেঘনাদবধ কাব্যে নাটকের লক্ষণ আছে- ঘটনা গ্রন্থনে দ্বন্দ্ব বস্তুর উপস্থাপনে সর্বোপরি চরিত্রগুলির মধ্যে নাট্যগুণের সৃষ্টিতে। পরবর্তী কালে মেঘনাদবধ কাব্য বহুবার সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। মধুসূদনের নাটকরচনার ক্ষমতা ছিল বলা যায় একটা সহজাত প্রবণতা ও ছিল। কিন্তু সেই ভাষার প্রশ্নই আবার উঠবে, এবং নাটক হিসেবে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আবেদন অনেকখানি সংশয়াকুল করে তুলবে। মুখের ভাষাই নাটকের ভাষা হবে, এমন নয়, কিন্তু ভাষার মধ্যে যদি প্রাণ সঞ্চার সম্ভব না হয়, তাহলে তা মঞ্চে কখনোই সফল হবে না। এবং এই প্রাণ সঞ্চার করার জন্য সংলাপের ভাষাকে চরিত্রের নিজস্বতা পেতে হবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা মধুসূদনের নিজস্ব ভাষা, এই স্ব- ব্যক্তিত্বের আরোপ আটকে আদৌ অভিপ্রেত নয়। শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, রাবণ চরিত্র অঙ্কনেও মধুসূদনের আত্মপ্রক্ষেপ – শুধু বিশেষ একটি চরিত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র নাটকীয় কাহিনির পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। মধুসূদনের নাটকগুলিতে অবশ্য আত্মপ্রক্ষেপ প্রবল নয়। এবং তা থেকেই বুঝি নাটকের নৈব্যক্তিকতা ধর্ম সম্বন্ধে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। কিন্তু সংলাপ রচনার ভাষায় (প্রহসনগুলি বাদে তিনি নাট্যধর্ম সঞ্চার করতে পারেননি। এইখানেই তাঁর সীমা।

এ ছাড়া পরিবেশগত কতকগুলি বাধ্যবাধকতা মধুসূদনকে মেনে নিতে হয়েছে। নাট্যমঞ্চের দিকে চেয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। ফলে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছেন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সম্বন্ধে

১) I have made the list of Dramatis Personae as shot as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

২) You suggest an under-plot, the suggestion is good,.. But it will involve the necessity of two more females... but masters Hookum is my motto.

৩) The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience. If I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fullness...

দৃশ্য সংস্থাপন সম্বন্ধে মধুসূদন শেক্সপীয়রীয় রীতিই গ্রহণিয় বিবেচনা করেছেন। তিনিই চেয়েছেন বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে, যাতে দর্শকেরা স্বতই এবং সর্বদাই ঘটনা ধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মধুসূদন প্রত্যেকটি দৃশ্যে স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাই একই অভিনেতাকে সাধারণত পরপর দুটি দৃশ্যে তিনি উপস্থিত করেননি। মধুসূদন স্থনগত ঐক্য এবং সাধ্যমতো কালগত ঐক্য বযায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

৫.৫ ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক

রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনা, অতীতজিজ্ঞাসা। জগৎ ও জীবনের পরিধি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়,- প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলা দেশে রেনেসাঁসের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যাশিত নয়, তবু তার আংশিক লক্ষণাতেও, অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল প্রবলভাবে লক্ষিত হয়েছে। এলিযাবেথীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং টিলিয়ার্ড এর প্রধান কারণ নির্দেশ করেছেন-

প্রথমত, অতীত ইতিহাসের অবলম্বনে ভবিষ্যৎকে জানবার চেষ্টা, অর্থাৎ ইতিহাসের সর্তকবাণীকে গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত অতীতের গৌরবোজ্জ্বল চরিত্র ও ঘটনাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ইতিহাস-কথাটি সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হলে কর্ণেল জেম্‌স টডের লেখা 'অ্যানালস্ অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস্ অফ রাজস্থান'। টড সাহেব পলিটিক্যাল এজেণ্ট হিসাবে অনেকদিন রাজস্থানে ছিলেন এবং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টডের জীবন বর্ণনা করেছেন। ১৮২৯ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দুখন্ডে বিলেত থেকে স্মিথ, এডলার কোম্পানি গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন। আধুনিক গবেষণায় টডের গ্রন্থে অনেক ভুল বেরিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে টড যে- যুগে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেযুগে তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুযোগ ছিল না। তিনি যা সংগ্রহ করতে পেরেছেন (দলিল দস্তাবেজ থেকে শুরু করে প্রবাদ-প্রবচন পর্যন্ত) সব কিছুই গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এবং নিঃসন্ধেহ পরবর্তী গবেষকদের কাছে টডের পুস্তকটি আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যের বিষয় গ্রহণ করেছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'ই প্রথম ইতিহাসশ্রয়ী বাংলা আখ্যান কাব্য – এবং এই ধারা অনুসরণেই সঙ্গে পরবর্তীকালে কাব্য-নাটক ও উপন্যাস রচিত হতে থাকে।

মধুসূদন রঙ্গলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে রাজপুত জীবন নিয়ে নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেন – কৃষ্ণকুমারী নাটক। রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখেছেন, 'The plot is taken from Tod, vol,I. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সন্ধান পেয়েছিলেন এই প্রবন্ধটি থেকে। কিন্তু প্রবন্ধে বর্ণিত কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে নাটকের কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য নেই; প্রবন্ধে বর্ণিত কাহিনি শেষ হয়েছে এই ভাবে 'সমরসী ও কৃষ্ণকুমারী সুখে কালযাপন করিতে করিতে লাগিলেন, এবং রাজা দেশের প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত নিযুক্ত রহিল।'

আমরা জানি ইতিহাস-কাহিনি থেকে ঘটনা, চরিত্র ও পটভূমি গ্রহণ করে জে-নাটক লেখা হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে। ইতিহাস স্থান-কাল-পাত্রের গন্ডিতে আবদ্ধ। একটা সীমিত কালের সাময়িক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হয় ইতিহাসের মধ্যে। সেখানে তথ্যই একমাত্র নির্ভরস্থল – এবং তথ্য যেখানে দুর্লভ, সেখানে ইতিহাস-কাহিনি অসম্পূর্ণ। ইতিহাসকে অবলম্বন করে যখন উপন্যাস বা নাটক লেখা হয়, তখন সেখানে শুধু ইতিহাসের সত্য নয়, সাহিত্যের সত্য রক্ষিত হয়। অথচ ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক নয়। ইতিহাসের সত্য, - রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিশেষ সত্য', অন্যদিকে সাহিত্যে 'নিত্য সত্য'র প্রকাশ। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকে ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃত রেখে সাহিত্যের রস পরিবেশন করতে হবে। এবং এই সাহিত্য-রস সৃষ্টিতে কবি-কল্পনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ বলবেন, 'সত্য যা রচিবে তুমি – ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে আওত্য জেনো।' ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকে সম্ভাবনার অবলম্বন মাত্র – ইতিহাসের

সত্যকে পরিবর্তন করা যাবে না, কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে। ইতিহাসের মধ্যে যে অংশগুলি ফাঁকা, স্বাধীন কল্পনার যোজনায় তাকে ভরাট করতে হবে।

অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে ইতিহাসের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতান্তরের অবকাশ আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, উপন্যাসেই ইতিহাসকে আনুপূর্বিকভাবে রক্ষা করতে হবে, কারণ সেখানে খুঁটিনাটি ব্যাপারও বর্ণিত হয়। অন্যদিকে নাটকে, ইতিহাসের সারভূত অংশটি গ্রহণ করলেই চলে, সেখানে সীমিত হতে হবে, এবং অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে হলে, তাঁকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত না করলেই নয়। কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক দিয়ে ঐতিহাসিক নাটক বিচার না করলে আমরা তার প্রতি অবিচার করব।

শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি আজও আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু কেন? দেশ ও কালের ব্যবধান তো অনেকখানি, - কেমন করে এই দূরত্বের অপনোদন সম্ভব হল? বলাবাহুল্য, এর উত্তরের মধ্যেই রয়েছে, ঐতিহাসিক নাটকের সফলতার রহস্য।

সমালোচকেরা শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে বিশেষ একটি লক্ষণ দেখেছেন, যা তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে ছিলি না। শেকস্‌পীয়র যদিও ইতিহাস থেকে চরিত্র আহরণ করেছেন, এবং রাজনৈতিক পটভূমিও যথাযথ রক্ষা করেছেন, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কতকগুলি মানুষের বর্ণনা করেননি, তাঁর রিচার্ড সেকন্ড, রিচার্ড থার্ড, হেনরি ফিফ্‌থ, সীযার প্রভৃতি কতকগুলি চরিত্র ‘ব্যক্তিচরিত্র’ রূপেই আজও আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে শেকস্‌পীয়র চরিত্র সৃষ্টিকালে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতের পরিচয় দেননি – ফলে হ্যামলেট, ম্যাকবেথের মতোই আন্তর-পরিচয় সমন্বিত চরিত্র হয়ে উঠেছে রিচার্ড সেকন্ড এবং অন্যান্যেরা। ইতিহাসের চরিত্র নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। হ্যাজলিট্‌ শেকসপীয়রের নাটকগুলি আলোচনাকালে ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব বিচার করেছেন, এবং ইতিহাসের পরিবেশনায় শেকসপীয়রের

প্রকৃত শক্তিকে 'Over-informing power' নামে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলতে পারি, 'সত্য রক্ষাপূর্বক বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা।' সৃষ্টিক্ষম কল্পনা ব্যতীত ইতিহাস প্রাণ লাভ করে না, রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত 'ঐতিহাসিক রস'ও সঞ্চারিত হয় না।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাকালে যতদূর সাধ্য টডের বর্ণিত আখ্যানকে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষে অন্যতর কোনো সূত্র থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহও সম্ভব ছিল না। মধুসূদন ইতিহাস-কাহিনিকে পরিবর্তি করতে চাননি, এবং মনে হয়, ঐতিহাসিক নাটকের যে আদর্শ তাঁর মনে ছিল, তাতে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখছেন, ''To complicate the Plot by the introduction of one or two more characters(male), would be to complicate it historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader''

রাজা ভীম সিংহ ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব নিয়েই 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' উপস্থিত হয়েছেন – বিষাদমগ্ন, গম্ভীর। কৃষ্ণকুমারী সরলা কুসুমকোমলা বালিকা। জগৎ সিংহ লঘুপ্রক্রতি, বিলাসী। বলেন্দ্র সিংহে গাম্ভীর্যে ও লঘুতার মিশ্রণ। ধনদাস চতুর দুর্বৃত্ত। ভীমসিংহের পত্নী রাণি অহল্যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষণ্ন, বেদনাভারাক্রান্ত। বিলাসবতী প্রেমবিলাসিনী। মদনিকা অস্থির প্রাণোদ্দাম, অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তপস্বিনী চরিত্র অপরিস্ফুট; তবে নাটকীয় কাহিনির পক্ষে তাঁর প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ইতিহাস থেকে ভীমসিংহ, কৃষ্ণকুমারী ও জগৎ সিংহকে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করার জন্য জগৎ সিংহ ও মান সিংহকে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করার জন্য জগৎ সিংহ ও মান সিংহের বিরোধও ইতিহাস সমর্থিত, এবং পিতার আদেশে কৃষ্ণার আত্মবিসর্জন টডের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য ইতিহাসের পটভূমি, চরিত্র এবং কাহিনির ফলশ্রুতি মধুসূদন অবিকৃত রেখেছেন, কাজেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ঐতিহাসিক নাটক বলতে বাধা দেখি না।

মধুসূদন ইতিহাস থেকে ভীমসিংহ, কৃষ্ণকুমারী ও জগৎ সিংহকে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করার জন্য জগৎ সিংহ ও মান সিংহের বিরোধও ইতিহাস সমর্থিত, এবং পিতার আদেশে কৃষ্ণার আত্মবিসর্জন টডের অবিকৃত রেখেছেন, কাজেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ঐতিহাসিক নাটক বলতে বাধা দেখি না।

মধুসূদন কাহিনিকে জটিল করার জন্য বিলাসবতী চরিত্রটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন; বিলাসবতীর স্বার্থেই মদনিকার চক্রান্ত, মান সিংহ কর্তৃক কৃষ্ণাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ, দ্বন্দ্বের সূচনা ও তীব্রতা। বিলাসবতী চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, মধুসূদন পত্রে লিখেছেন, 'This জগৎ সিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the 'Essence of Camphor', I think we may bring her in and allow her jealousy full play.'

বিলাসবতী সখী মদনিকা চরিত্রটির ব্যবহার সম্বন্ধে সংগত প্রশ্ন উঠতে পারে। এই অনৈতিহাসিক চরিত্রটিকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হল কেন, যাতে মনে হতে থাকে জগৎ সিংহ ও মান সিংহের বিরোধ তারই চক্রান্তের প্রত্যক্ষ ফল। ইতিহাসের সত্যরক্ষা করতে গিয়ে মধুসূদন মান সিংহকে একবারও মঞ্চে উপস্থিত করলেন না, যদিও তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়; অথচ কল্পিত একটি চরিত্র মদনিকা, নাটকের ঘটনা-গতি নিয়ন্ত্রণে অধিকার পেল কি করে?

অহল্যা, তপস্বিনী, ধনদাস, - এরাও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্ভাবনাপ্রসূত। কাহিনির অগ্রগতিতে তাদের প্রয়োজনও স্বীকার্য। তারা কখনও নিজেদের সীমা অতিক্রম করেনি।

কিন্তু মদনিকা সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। আসলে মধুসূদনের দুর্বলতা ছিল মদনিকা সম্বন্ধে; পত্রে তিনি লিখেছেন – "'That Madanika is my favourite.' এই মদনিকা মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছে, বিপথে চালিত করেছে। মধুসূদন অবশ্য ভেবেছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রেই কল্পনার আশ্রয় নেওয়া দোষের – অনৈতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কল্পনার অবাধ বিস্তার ক্ষমার্হ। পরবর্তী কালেও বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ দেখি।

আসলে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নাট্যকারের ইতিহাসবোধের অভাব। মধুসূদন অবশ্যই টডের কাহিনিকে বিকৃত করতে চাননি, কিন্তু সেই কাহিনির নাট্য-সম্ভাবনাকেও তিনি কাজে লাগাতে সম্মত হননি। ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা বর্তমানের সঙ্গে যোগে, তা না হলে সে কাহিনির কোনো ঐতিহাসিক মূল্যই নেই। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে মধুসূদন ব্যক্তিত্বমন্ডিত করে তোলেননি। নাট্যকারের কল্পনা সম্ভবত উদ্দীপ্ত হয়নি বলেই কৃষ্ণকুমারীর মতো চরিত্র নাটকে শুধু করুণ বলেই প্রতিভাত হয়, হৃদয়ের উত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে না। ইতিহাসের সঙ্গে যেন এই চরিত্রগুলির যোগ নিতান্ত শিথিল। এবং এইখানেই নাটকটির শোচনীয় ব্যর্থতা। মধুসূদন টডের রাজস্থান থেকে শুধু কাহিনি অংশটুকুইগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার প্রকৃত তাৎপর্য যে রাজপুত জীবনসন্ধ্যায় বিলীয়মান সূর্যরশ্মির রক্তিমাভা, তা নাটকে সঞ্চারিত করতে পারেননি। ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গে নিকলের সুচিন্তিত মন্তব্য মনে পড়বে, -

"One principal interest for these dramatists is theme taken from the past lies, of course, in the manner through which comment on the present day may be made through the choice of subject-matter from past ages, and for some there is the added incentive which comes from realization that only through the handling of a 'distanced' story can there be even a hope of approaching the quality of tragedy."

নিকল যাকে ট্র্যাজেডির রস বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'ঐতিহাসিক রস' বলেছেন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রাজপুত ইতিহাসের অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া ফোটেনি; অন্যদিকে আত্মসম্মানবোধ – এই সব কিছু মিলে অতি তীব্র সংঘাতপূর্ণ সেই যুগকে মধুসূদন পটভূমি হিসেবে স্থাপন না করে, সামাজিক জীবনের ছোটখাট লোভ, ঈর্ষা, বিবাদ বিসংবাদকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে 'অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে 'একটি চিত্ত বিস্ফারক দূরত্ব ভো বৃহত্ব'

লক্ষ্য করছেন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' তা থেকে বঞ্চিত। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' ঐতিহাসিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি, ফলে কাহিনির মধ্যে শুধু চমৎকারিত্বের অভাব ঘটেনি, সেই সঙ্গে নাটকীয়তারও অভাব অনিবার্য হয়েছে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ সৃষ্টির জন্য মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লেখগেননি। মঞ্চের প্রয়োজনে উদ্যোক্তাদের রুচি মতো, যে নাটক তিনি লিখতেন, তাই-ই পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শে পরিণত হল। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' র ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেখানেই।

৫.৬ অনুশীলনী

১) বাংলা নাটকের প্রথমাবধি অবস্থান পরিষ্কার করে মধুসূদনের উত্থান আলোচনা কর।

২) বাংলা নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনার ধারায় মধুসূদন কেমন করে বিপ্লব এনেছিলেন লেখ।

৩) মধুসূদনের নাট্যাদর্শের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৪) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন কোন বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে? মত প্রতিষ্ঠা কর।

৫) ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কৃষ্ণকুমারী নাটকের বৈচিত্র্য কোথায় আলোচনা কর।

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকুমারী নাটক- অলোক রায় সম্পাদিত।

একক ৬- ট্রাজেডি, গঠনশৈলী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব

বিন্যাসক্রম

৬.১ ট্র্যাজেডির আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক

৬.২ গঠন ও ঘটনার বৈচিত্র্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক বিশ্লেষণ

৬.৩ পাশ্চাত্য প্রভাব

৬.৪ প্রাচ্য প্রভাব

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি।

৬.১ ট্র্যাজেডির আদর্শ ও কৃষ্ণকুমারী নাটক

উনবিংশ শতাব্দিতে, বাংলা নাটকের সূচনা পর্ব থেকে বিয়োগান্ত নাটক লেখা হতে থাকে। আমরা দেখেছি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জি সি গুপ্তের কীর্তিবিলাস নাটকের আদর্শ ছিল শেক্সপীয়র নামা ইংলন্ডের মহাকবি। কীর্তিবিলাসের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পন্ডিতেরা অনুমান করিতেন, ‘যে ধার্মিক ব্যক্তি দুঃখাভিনয় করবার সময়ে তাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি’ । বলা বাহুল্য ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, বাংলা ভাষায় বিয়োগান্ত নাটক লেখা শুরু হল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের ভূমিকায় দাবি করা হয়েছে যে, ‘বিধবাবিবাহ নাটক is the first attempt made to introduce the regular tragedy into bengalee drama’ এইভাবে ধীরে ধীরে বিয়োগান্ত নাটকের সঙ্গে বাঙালী সমাজ পরিচিত হল। এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কৃষ্ণকুমারী নাটক বিয়োগান্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বজন কর্তৃক সাদরে গৃহীত হল। সমকালে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন (১৮৬০) নাটকও বিয়োগান্ত।

সংস্কৃত সাহিত্যের করুণ রস অপ্রতুল নয়। নিষাদ কর্তৃক অরণ্যে নিষ্ঠুরভাবে ক্রৌঞ্চকে নিহত হতে দেখে বাল্মীকির মনে যে শোকের উদয় হল, তা থেকে জন্ম নিল শ্লোক – 'শোচতোক্তং ময়া যস্মাৎ তস্মাচ্ছোকো ভবত্বিতি' এবং বেদনায় অন্তর করিয়া বিদরিত মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত – তাঁর সাহায্যেই রচিত হল পৃথিবীর মহত্তম অমর বাক্যঃ- রামায়ণ। পৃথিবীর মহৎ কাব্য মাত্রের উৎস এই আদি কবির বেদনাবোধ – শোকভাব। 'করুণার উৎসমুখে যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে তাঁর মধ্যে রয়েছে সকল ট্র্যাজেডির প্রাণ পেল না।'

ট্র্যাজেডি শব্দটি ইউরোপীয়, এবং শব্দটির ভাষান্তর সম্ভব নয়। এইভাবে বলা ভালো, আমাদের দেশে সমালোচকেরা ট্র্যাজেডি –র বাংলা পরিভাষা হিসেবে বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা আরও বলেন ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় ট্রাজেডি এক হবে এমন কোন কঠোর নির্দেশ না থাকাই ভাল। কিন্তু ট্র্যাজেডি শব্দটি দ্বারা ইউরোপীয় নাট্যশাস্ত্রে যে বিশিষ্ট নাট্যলক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তাঁকে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো বিকৃত ও পরিবর্তিত করতে পারি না। আমাদের দেশে ট্র্যাজেডি না লেখা হতে পারে, এবং তাঁর কারণ থাকাও সম্ভব। তাই বলে আমাদের দেশীয় রস – সংস্কার মতো ট্র্যাজেডি শব্দটি শিথিল অর্থে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশে যে সব নাট্যকার ট্র্যাজেডি লিখতে চেয়েছিলেন, তাদের নাটক বিচার কালে ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির মানদণ্ডেই তা বিচার করতে হবে।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' কে ট্র্যাজেডি নামেই অভিহিত করেছেন, কখনও 'রোমান্টিক ট্র্যাজেডি', কখনও 'হিস্টোরিক ট্র্যাজেডি'। ট্র্যাজেডির রূপভেদ আছে, কিন্তু রসভেদ নাই। সৌভাগ্যের শীর্ষচূড়া থেকে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে একটি চরিত্র নিক্ষিপ্ত হয়, ভাগ্য চক্রের এই আবর্তন আকস্মিক কিন্তু মানবের কর্মচক্রের অনুসরণেই তাঁর আবির্ভাব। গ্রীক নাটকে নায়কের কোনো পাপ বা ভ্রান্তি কেও এই পরিণতির জন্য দায়ী করা হত। অবশ্য এই পাপ বা ভ্রান্তি অজ্ঞানকৃত। নায়ক সৎ অভিপ্রায় নিয়েই কাজ করে এবং প্রত্যাশা করে সাফল্য। কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীত ফল এসে উপস্থিত হয়, -

মানবের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ভাগ্যের নির্মম শক্তির সামনে অসহায় মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে; কর্ম ও কর্মফলের বৈপরীত্য দর্শনে তাঁর মনে দেখা দেয় ভয় ও হতাশা।

'এককালে মানুষকে দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে, প্রমিথিউসের মতো দেবরোষের বিরুদ্ধে ইদিপাসের মতো। ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির অবলম্বন বিপরীতমুখী শক্তির সংঘাত। গ্রীক নাটকে প্রধানত বহিঃসংঘাতের রূপায়ন যদিও মনের দ্বন্দ্ব নেই, তা নয়।'

অন্যদিকে শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে অন্তর্সংঘাতই প্রবল। আরোও গভীর ভাবে দেখলে মানবজীবনের মূলে যে অসহায়তা এবং আর্তিবোধ – তাঁর মধ্যে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে বিরোধই হোক অথবা অন্তরের বিপরীতমুখী সংঘাত সৃষ্টি হোক – মানুষ সর্বত্রই অসহায়। বৃত্তি নিচয়ের অসামঞ্জস্যই যদিও ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বিয়োগান্ত পরিণতি এনে দেয়, তবু তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব এ ব্যাপারে অল্পই। অবশ্য প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রতিকূল প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ এবং সংগ্রাম বিমুখ নিরুপায় ব্যক্তিত্বহীন পুরুষকে আমরা কখনোই ট্র্যাজেডির নায়কের গৌরব দিই না।

মধুসূদন তাঁর পত্রাবলীতে কখনও গ্রীক নাটকের উল্লেখ না করলেও এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রসঙ্গে বারংবার শেক্সপীয়রের নাটকের উল্লেখ করা সত্ত্বেও, - 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' কে আমরা রোমান্টিক ট্র্যাজেডির নির্দশন না বলে গ্রীক ট্র্যাজেডির নির্দশন বলব। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বিষাদের সুপরিব্যপ্ত, এবং কৃষ্ণকুমারী ও ভীমসিংহ বিষাদের প্রতিমূর্তি। সমগ্র নাটকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীর নিয়তি যেন অদৃশ্য একটি চরিত্র রূপে অবস্থান করেছে। এবং তারই চক্রান্তে রাজকুমারীর শোচনীয় মৃত্যু। কৃষ্ণকুমারী চেয়েছে মানসিংহ পতিরূপে পেতে, 'বলাবাহুল্য এর পিছনে একটা ভ্রান্তি লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই প্রত্যাশা এনে দিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল, - যার কাছে সে একান্ত অসহায়। দুর্ভাগ্য যেন কৃষ্ণা কে আরম্ভ থেকেই নিজের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছে।'

ট্র্যাজেডির পক্ষে যে সংঘাত কাম্য, তাঁর প্রকাশ হয়েছে মেবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। জগৎ সিংহ ও মানসিংহের বিরোধের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মধ্যে এই বিরোধ সমগ্র দেশ জাতিকে বিচলিত করেনি – ধনদাস ও মদনিকার কৌশলে, সীমিত একটি মাত্র ক্ষেত্রে ঘটনার অগ্রসৃত। নাটকের পক্ষে চরিত্রের পরিবর্তন বা বিকাশ সাধন যে একান্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মধুসূদন সর্তক ছিলেন না। ফলত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি একদিকে যেমন কৃষ্ণকুমারী নাটকে নেই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির গভীরতা ও তেমনি এর মধ্যে প্রকাশ পাইনি।

সুন্দরী কুসুম কোমল রাজকুমারীর জীবনে দৈব অভিসম্পাতের মতো দুর্বিপাক নেমে এসেছে। এবং পিতা মাতার শত চেষ্টাতেও কন্যাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ছে; রাজকুমারীর আত্মবলিদানে নাটকের পরিসমাপ্তি। এর সঙ্গে ইউরিপিদিসের নাটকের অতি প্রকট সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু গ্রীক নাটকে জীবনের মূলে গভীর একটা বেদনাবোধ, যা প্রচ্ছন্ন ভাবে নিঃসহায়তার ভীতিরূপে তা আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কৃষ্ণকুমারী নাটকে অনুপস্থিত। আগামেম্ননন, ক্লাইটেম্নেস্ট্রা ও ইফিজেনিয়ার সামনে যে জটিল সমস্যা এবং দিগন্ত ব্যপী জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর উত্তর দিয়েছেন ইউরিপিদিস। এবং চরিত্রগুলি সেখানে বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘাতে এবং মগ্নচেতন জৈব প্রবৃত্তির বলিষ্ঠ প্রকাশে ভাস্বর।

আসলে প্রতিকূল ভাগ্যের পরিহাসে কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রধান চরিত্র ব্যাথাবিক্ষুদ্ধ সমুদ্রে নাবিকহীন নৌকার আরোহীর মতো ইতস্তত ভাবে ভয়ার্ত চিৎকার করেছে এবং শেষে সলিল সমাধির মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু গ্রীক নাটকে অনেক যন্ত্রণা এবং দুর্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত আগামেম্নেন ও ক্লাইটেম্নেস্ট্রা। এবং গ্রীক ট্র্যাজেডির তীব্রতার অন্যতম কারণ এই চারিত্রিক দার্ঢ্য এবং পুরুষত্ব। শেক্সপীয়ারের নাটকও অন্তরপ্রবৃত্তির সঙ্গে দুর্দমনীয় সংগ্রামের প্রতিটি চরিত্র ক্ষতবিক্ষত।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে অনেক হাহুতাশ আছে, অনেক আত্মবিশ্লেষণও আছে, কিন্তু সে তীব্রতা কোথাও নেই, যার ফলে কোনো ঘটনা বা চরিত্র ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করতে

পারে। ইউরিপিডিসের নাটকে ইফিজেনিয়ার মৃত্যু দেখানো হয়নি; কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর নাটকীয় মৃত্যু আমরা দেখেছি। অথচ মৃত্যুর ভয়াবহতাও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এ বিস্তৃতি বা গভীরতা আনতে পারেনি; কারণ কৃষ্ণকুমারীর মান সিংহের প্রতি আকর্ষণ এবং স্বেচ্ছামৃত্যু – সবটাই আকস্মিক কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ এবং ফলে চরিত্রের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার অসম্ভব হয়েছে।

ভীম সিংহের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি। নাটকে গোড়া থেকেই তিনি ভগ্নহৃদয় এবং অস্থির। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক নায়কের একমুখীনতা নেই। আবার অন্যদিকে যুক্তিতর্কবন্ধুর দার্শনিকতা উপলব্ধির মধ্যে আসে নি। অর্থাৎ লিয়র বা হ্যামলেটের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য অসম্ভব। অথচ ভীম সিংহের কাতর পিতৃহৃদয়, - রাজকর্তব্য ও বাৎসল্যের দ্বন্দ্বময় সংঘাত তাঁর ভিতর দিয়েই সার্থকতা দেখানোর চেষ্টা চলেছে। প্রতিরোধ শক্তির অভাবে ভীম সিংহ ট্রাজেডি-অভীপ্সিত 'ট্রাজিক পার্সোন্যালিটি' লাভ করেনি।

অবশ্য নাটকের গঠনে মধুসূদন ট্র্যাজেডির ভাবধর্মকে যথাসাধ্য রক্ষা করেছেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন 'Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.' কৃষ্ণকুমারী নাটকের শেষাংশে ভীম সিংহের উন্মত্ততায়, কৃষ্ণকুমারীর আত্মহননে, এবং দৃশ্যান্তরালে অহল্যাদেবীর মৃত্যুতে শোকভাব (প্যাথস) উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকের প্রথমার্ধের লঘু সুর নাটকের শোকান্ত পরিণামের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশংসনীয় নয়। নাট্য-পরিকল্পনায় কোথায় যেন একটা ত্রুটি আছে মনে হয়। সম্ভবত দর্শকদের কথা এভেবেই ধনদাস-মদনিকার দৃশ্যগুলিকে কিছু কৌতুকপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। (উদ্যোক্তারা আরও কিছু লঘু দৃশ্য চেয়েছিলেন)। কিন্তু মধুসূদন আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে দৃশ্যগুলিকে মূল ভাববস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন, এবং মদনিকার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটা যায়গায় থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন –

"As the play tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination to of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play... The only piece of criticism I shall venture upon is this... never strive to the comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important sencenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan."

নাটকের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন সতর্ক ছিলেন, এবং ক্ষেত্র বিশেষে তিনি অসামান্য সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিন্তু নাটকের পক্ষে যে কবিত্বকে তিনি চিরকাল অবাঞ্ছনীয় মনে করেছেন, কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র ভীমসিংহ ও কৃষ্ণকুমারী সেই উন্মাদনায় উদ্বেল। পরে আমরা মধুসূদনের গদ্যরীতির আলোচনাকালে দেখব সংলাপ রচনার ব্যর্থতায় নয়, গদ্যরীতির আড়ষ্ট ব্যবহারেই কৃষ্ণকুমারী নাটকের গভীর গম্ভীর দৃশ্যগুলি দর্শক মনে স্বতোৎসারিত শোকভাব জাগিয়ে তুলতে পারে না। ভাষার কৃত্রিমতায় চরিত্রগুলির আবেগকে অনেকটা কৃত্রিম করে তুলেছে।

দৃশ্যপট স্থাপনায় মধুসূদন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন – কৃষ্ণকুমারী নাটকে। বিশেষ করে নাটকের পঞ্চমাংকে একলিঙ্গের মন্দির সম্মুখে দৃশ্যে অন্ধকার, ভয়, রহস্য এবং অতিলৌকিকতা মিলে শেক্সপীয়রের কোনো কোনো ট্র্যাজেডির অনুরূপ দৃশ্যপটের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকুমারীর আসন্ন বিপদের পূর্বে যে ঝটিকাসংক্ষুব্ধ বিদ্যুৎ আলোকিত ভয়ঙ্কর রাত্রিকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে তা বিশেষ রূপে ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ।

সঙ্গীতের ব্যবহারে অবশ্য মধুসূদন এতখানি নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। সঙ্গীত গুলি প্রধানত মঞ্চের জন্য এসেছে। সাইকোলজিক্যাল সেটিং সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া অনেকগুলি গান রচনা করেছেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; এক্ষেত্রে গানগুলিকে আরোপিত বলতে হবে। তবে কৃষ্ণার মুখে বসানো সঙ্গীত গুলির মধ্যে একটা

বিষাদমগ্নতার সুর আছে এবং এই সুরই নাটকের ফলশ্রুতিকে অনেকটা শোক ভারাগ্রস্ত করে তুলেছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক সার্থক ট্র্যাজেডি নয়, কিন্তু নাটক হিসেবে ব্যর্থ বলি না। মধুসূদন সাহিত্যের অন্যতর ক্ষেত্রে যেখানেই সক্রিয় প্রদর্শনে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে যে দীপ্তি ফুটেছে, নাটকে তাঁর অভাব আছে। তাঁর মানে, নাটক লেখার প্রতিভা মধুসূদনের ছিল না, তা নয়। আসলে কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখার সময়ে তিনি ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির সকল লক্ষণ একত্রিত করেছেন, কিন্তু তাঁর সক্রিয় প্রতিভা যা বন্ধন-মুক্তি এবং বিদ্রোহের মধ্যে সমুজ্জ্বল, তাঁর প্রকাশ হয় নি। তিনি এরজন্য আমাদের সমাজ, অভিনেতা, মঞ্চকে দোষ দিয়েছেন; এবং এই অভিযোগ কিছুটা সংগত বটে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' যিনি লিখেছেন তাঁর কাছে নিশ্চয় ট্র্যাজেডির আন্তর পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে' চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন আপন হৃদয়ের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা এবং কবিমনের বেদনা ও উল্লাসেকে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তাঁর স্বকীয়তার স্বতঃপ্রকাশ; কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকে ইউরোপীয় ট্রাজেডির প্রচলিত অলৌকিক নক্সার উপর হাত পাকানো হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালেও বাঙালী নাট্যকারেরা এই একই ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি সূত্রকে চরিত্র এবং ঘটনার সাহায্যে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির অন্তর্সংঘাত, মানসপরিবর্তন ও বিকাশ ধারা এবং কাহিনির অন্তে জীবন ও জগত সম্বন্ধে সর্বব্যাপী হাহকার কখনও বাংলা ট্রাজেডিতে ফুটে ওঠে নি। বাংলা ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুর ঘনঘটা আছে, - করুণ রসাত্মক দীর্ঘ বক্তৃতা আছে, - এবং আকস্মিকতা ভরা বিপর্যয়ভরা চিত্র আছে। মধুসূদন অবশ্য ট্র্যাজেডির একটি উন্নততর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বহিরঙ্গ ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন, ট্রাজিডির অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি দিয়ে যেতে পারেননি; কৃষ্ণকুমারী নাটকে এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে মধুসূদন অবহিত ছিলেন তাঁর প্রমাণ আছে তাঁর পত্রাবলীতে।

৬.২ গঠন ও ঘটনার বৈচিত্র্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক বিশ্লেষণ

কৃষ্ণকুমারী নাটকের পূর্বে বাংলা যে সব নাটক লেখা হয়েছে তাদের গঠন প্রশংসনীয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি সংলাপ সর্বস্ব আখ্যান মাত্র। কাহিনি বৃত্ত রচনার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য পরম্পরার সমাবেশ – যার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো যোগসূত্র নেই। উপন্যাসের গঠন শিথিল - সংবদ্ধ হতে পারে – সেখানে একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ হতে পারে। কিন্তু নাটকের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা মতো কাহিনি বৃত্ত রচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব বস্তুকে অনুসরণ করে কাহিনির অগ্রসরতা। এবং নাটকের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি অন্তরঙ্গ সম্পর্কে পরম্পর সংযুক্ত। উদ্দেশ্যমূলক নাটকে অবশ্য অনেক সময় বিশেষে একটি দৃশ্যের জন্যই একটি দৃশ্যে রচনা। যেমন নীলদর্পণ নাটকে; কিন্তু এর ফলে নাটক হিসেবে তা দুর্বল হতে বাধ্য। ঘটনা -পারম্পর্য নাটকে একটি বৃত্ত রচনা করে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে আমরা সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত একটি কাহিনি পেলাম। এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনে স্থাপত্যসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য করলাম।

কৃষ্ণকুমারী নাটক বিয়োগান্ত। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাংকে অম্বররাজ জগতসিংহ কৃষ্ণার চিত্রপট দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলেন; কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী নারায়ণ মিশ্র জানেন যে, মরু দেশের অধিপতি মানসিংহ কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী। তিনি আরোও জানেন যে জগত সিংহের সঙ্গে মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন সর্বথা পরিহার্য; দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।' জগত সিংহ মন্ত্রীর এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করে মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণাকে নিয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করলেন না। - এইখানেই ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত হল। এই বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলে ফুলে শোভিত হওয়ার ব্যাপারে মদনিকা ও ধনদাস সাহায্য করেছে। এই বিরোধেরই স্বাভাবিক পরিণাম ঘটেছে কৃষ্ণার মৃত্যুতে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে কাহিনি বৃত্ত পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এবং সাধারণ ভাবে বলা যায়, নাটকের পঞ্চসন্ধি পাঁচটি অঙ্কে অবস্থান করেছে। কাহিনির পরিণাম সুনিশ্চিত ভাবে

সূচিত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে, যেখানে কৃষ্ণার মনে মানসিংহের প্রতি অনুরাগ, ভীমসিংহের নিকট মানসিংহের দূত প্রেরণ, মহারাজাধিপতির মানসিংহের পক্ষে যোগদান এবং সর্বোপরি স্বপ্নে পদ্মিনী কর্তৃক কৃষ্ণাকে আত্মবির্সজনে উৎসাহ দান, নাটকের গর্ভসন্ধি নির্দেশ করেছে। চতুর্থ অঙ্কে বিমর্ষ সন্ধি এবং পঞ্চম অঙ্কে উপসংহতি বা Catastrophe।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডির মতো ঘটনার ঘনঘটা নেই নিশ্চয় কাহিনিবৃত্তে চমৎকারিত্ব অথবা জটিলতা দুয়েরই অভাব দেখা যায়। মোটের উপর একমুখী এবং সরলবৃত্ত কাহিনি। মানসিংহের অনুপস্থিতি নাটকীয় সংঘাতকে তীব্র হতে দেয়নি। ধনদাস ও মদনিকার প্রয়াস-প্রযত্ন নাটকের উপরিতলে অবস্থান করেছে। একমাত্র ভীম সিংহের উন্মত্ততা ছাড়া কাহিনিতে নাটকীয়তা নেই বললেই চলে। এবং এদিক দিয়ে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ সংস্কৃত নাটকের সমধর্মী; অবশ্য প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, মধুসূদন এর জন্য দায়ী করেছেন মঞ্চব্যবস্থা এবং অভিনেতার অভাবকে। তিনি পত্রে লিখেছেন – “I have made the list of Dramatis Persons as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy!”

পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় নাট্যকার অনেক ঘটনাকেই স্বল্প বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সেরেছেন। অথচ তিনি ছিলেন – “Very fond of busy and varied scenes”। বলা বাহুল্য এই দুয়ের মধ্যে একটা সংকটে পড়তে হয়েছিল মধুসূদনকে। পরে তিনি যা দিতে পেরেছিলেন, তারই জন্য কৃতজ্ঞ আছি আমরা তাঁর কাছে।

অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ঘটনা-বিরলতার নাটকে হয়তো মঞ্চ সাফল্য দেবে না। তার উত্তরে মধুসূদন লেখেন, - ‘As for ‘Variety of action there is not much of it, to be sure, but the result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is

your province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage' এ থেকে আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারছিঃ- প্রথমত, কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'Variety of action' এর অভাব মধুসূদনকে পীড়া দিয়েছে; দ্বিতীয়ত এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন টডের বর্ণিত আখ্যানকে- 'barrenness of the Plot'

তৃতীয়ত নাটকটির মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন।

মধুসূদন এই পত্রের প্রথমাংশ পরবর্তীকালে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে সত্যই, টডের বর্ণিত আখ্যান ঘটনা-বিরল কিনা এবং তা যদি হয় তাহলে কৃষ্ণকুমারী নাটকে মূল আখ্যানের ঘটনা বৈচিত্র্য অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন কিনা।

বলাবাহুল্য টড বর্ণিত কৃষ্ণকুমারী আখ্যান আদৌ ঘটনা-বিরল নয়। আমরা টডের বর্ণনার পাশাপাশি প্রকৃত প্রস্তাবে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী যেন মূল আখ্যানের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন। টডের রাজস্থানের ভীমসিংহের অবস্থা বর্ণনায় যে নাটকীয়তা ছিল, মধুসূদন তাকেই বাদ দিয়েছেন। মেবারের আবর্তময় ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে সিন্ধিয়া ও হোলকারের ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলির বিদ্রোহে এবং সর্বোপরি জয়পুর ও মরুদেশের রাযার বিরোধের ফলে এক ভয়াবহ প্রবল সমস্যা-জড়িত। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ইতিহাসের সেই প্রচণ্ড গতিকে সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় নি। ফলে নাটক কখনও ব্যপ্তি লাভ করতে পারেনি – চরিত্রগুলি স্নায়ু এবং মৌলিক দুর্বলতায় গঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ইতিহাস ও শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র মানবকে যেভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন, তাতে উপন্যাস হয়েও নাটকীয়তা লাভ করেছে। ঘটনার বৈচিত্র্য ও দ্রুততা তাঁর অন্যতম আকর্ষণ। অন্যদিকে মধুসূদন ইতিহাস থেকে ক্ষুদ্র মানবকে বিযুক্ত করে নিয়েছেন, ফলে নাটক হয়ে পড়েছে ঘটনা-বিরল এবং মন্থর গতির। মধুসূদন ইতিহাস কাহিনির সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

অবশ্য এমন হতে পারে যে, মধুসূদন তাঁর সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণকুমারীর প্রতি। কৃষ্ণকুমারীর দৈব প্রতিহত জীবনের করুণ মাধুর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল; পঞ্চমাংক লেখা শেষ করে তিনি কেশবচন্দ্রকে জানিয়েছেন, - "I flatter

myself you will like the Fifth Act, I shed tears when poor Kissen Kumari stabbed herself and fell on her bed!"

মধুসূদন হয়তো ভেবেছিলেন, রাজনৈতিক ঘটনাবর্তকে প্রাধান্য দিলে নায়িকা চরিত্র ম্লান হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘটনা বলতে শুধু রাজনৈতিক আবর্ত বোঝায় না। বুচার স্পষ্ট করে বলেছেন, বহির্জগতের প্রকাশেই ঘটনার প্রকাশ তা সত্য নয়, বরং অন্তরজগতের প্রকাশে ব্যক্তি সত্তার উদ্ভাসই নাটকীয়তার সৃষ্টি করে –

"... action' in Aristotle is not purely external act, but an inward process which works outward, the expression of a man's rational personality'

কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাই ঘটনা-বিরলতা এসেছে চরিত্রের অস্পূটতাকে আশ্রয় করে। ট্রাজেডির আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি রূপেও কৃষ্ণকুমারী নাটক যেমন সার্থক হয়নি, ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি রূপেও তা তেমনিই অসার্থক অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাবর্ত এবং সমষ্টিজীবনের রূপায়নে মধুসূদনের আগ্রহ ছিল না; অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা কে তুলে ধরতে গিয়েও, তিনি ব্যক্তির অন্তর্পরিচয় আবিষ্কারে নিরুদ্যম থাকায়, নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী' ঘটনাবিরল হতে বাধ্য। মধুসূদন ঘটনা বলতে ক্রিয়া বুঝেছেন; এবং কৃষ্ণকুমারীর জীবনে ক্রিয়া (বুচার যাকে ডুইং বলেছেন) অভাবকেই নাটকের ঘটনা-বিরলতার জন্য দায়ি করেছেন।

৬.৩ পাশ্চাত্য প্রভাব

মধুসূদনের নাট্যাদর্শের উপর ইউরোপীয় নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখার সময়ে। জীবনের রুঢ় নিষ্ঠুর বাস্তব অনুভূতিকেই তিনি নাটকের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিষয়বস্তু এ ব্যাপারে তাঁকে আনুকূল্য দান করেছিল। ভারতীয় জীবনাদর্শে যে শুভবোধের ও মঙ্গলময় পরিণামের দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তা উচ্চাঙ্গের কাব্যের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র এইজন্য কালিদাসের শকুন্তলাকে নাটক না বলে কাব্য নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু

মধুসূদন ট্র্যাজেডি লিখতে বসেছেন। নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্ত, নিষ্পাপ সরলা রাজকুমারীর অসহায় আত্মবিসর্জন পিতৃহৃদয়ের কাতর আর্তনাদ, পরম হতাশা ও নৈরাশ্য কৃষ্ণকুমারী নাটককে যে তীব্রতা দিয়েছে, তা ভারতীয় নাট্যাদর্শে কখনও প্রত্যাশিত নয়।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে বিষয় আহরণ করেছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে এবং টডের গ্রন্থের কাল্পনিকয়তা কম বেশি থাকলে অন্তত কৃষ্ণকুমারী আখ্যানে কল্পনার সুষমা ও আদর্শবাদের আরোপ ছিল না... অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সময় কৃষ্ণকুমারীর জীবননাট্য রাজপুতানায় অভিনীত হয়, সে সময়ে টড রাজপুতানাতেই অবস্থান করছেন। এবং সেদিক দিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী নাটককে বাস্তব জীবনাশ্রয়ী নাটক বললেও ভুল হবে না। সেই জন্যই বোধহয় নাটকের মধ্যে জীবন-সংরাগের তীব্রতা এত প্রবলভাবে প্রকাশ পেতে পেরেছে।'

অবশ্য টডের গ্রন্থ থেকে বিশেষ ভাবে কৃষ্ণকুমারী আখানটি নাটকের বিষয়রূপ নির্বাচন করার পিছনে নাট্যকারের জীবনাদর্শ আভাসিত হয়েছে। এবং মধুসূদনের সাহিত্যাদর্শে পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল অতি প্রত্যক্ষ। এই দিক দিয়েই ইউরোপীয় নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সাদৃশ্য আবিষ্কারে উৎসাহিত বোধ করেন অনেক পণ্ডিতমহল।

কৃষ্ণকুমারীর জীবনের সঙ্গে গ্রীক রাজকন্যা ইফিজেনিয়ার কাহিনির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আগামেমননের নেতৃত্বে গ্রীক সেনাবাহিনি ট্রয় অধিকারের জন্য যাত্রা করবে। অলিসের বন্দরে বিরাট গ্রীক নৌবাহিনি প্রস্তুত। কিন্তু উত্তরের প্রবল বাতাস যাত্রার অনুকূল নয়। দিনের পর দিন অস্থির প্রতীক্ষা। কিন্তু ঝড়ের বিরাম নেই, শেষ পর্যন্ত জানা গেল, দেবতা আর্টেমিস গ্রীক বাহিনির প্রতি বিরূপ হয়েছেন। এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হলে সেনাপতি আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে দেবতার কাছে বলি দিতে হবে। আগামেমননের না প্রাথমিক দ্বিধা কে অতিক্রমন করে,যুদ্ধ জয়ের একাগ্র বাসনায় কন্যাকে দেবতার মন্দিরে বধ করার আদেশ দিলেন। ইফিজেনিয়ার রক্তে আর্টেমিস তৃপ্ত হলেন এবং উত্তরের বাতাস বন্ধ হল।

ইফিজেনিয়ার জীবন নিয়ে লেখা ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া ইন অলিস' নাটকের পরোক্ষ প্রভাব কৃষ্ণকুমারীর নাটকের উপর পড়েছে, এমন কথা সমালোচকেরা জানিয়েছেন। মধুসূদন তাঁর পত্রাবলীতে কখনও গ্রীক নাটকের উল্লেখ করেননি, সুতরাং ইউরিপিদিসের নাটকের সঙ্গে তাঁর কতখানি প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল তা আমরা জানতে পারি না। তবে গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, এমন কথাও বলতে পারি না।

এইখানে কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপর একটি ফরাসি নাটকের প্রভাবের কথা উল্লেখ করব, যার কথা ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয়নি। মধুসূদন ফরাসি নাটক ও নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং টডের যে গ্রন্থ থেকে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর আখ্যানটি গ্রহণ করেছেন, তারই মধ্যে টড সাহেব রাসিনের একটি বিখ্যাত নাটক ইফিজেনির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারী আখ্যানের সাদৃশ্য আলোচনা করেছেন। মধুসূদন যদি রাসিনের নাটকটি আগে নাও পড়ে থাকেন, টডের গ্রন্থাবলম্বনে কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখার সময়ে ইফিজেনি নাটক নিশ্চয় পড়ে নিয়ে ছিলেন। অবশ্য ভীমসিংহ চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে আগামেম্ননন চরিত্র দ্বারা মধুসূদন বিশেষ প্রভাবিত হন নি। আগামেম্ননন চরিত্রের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ভীমসিংহের মধ্যে ফোটে নি। তবে ইফিজেনির পিতার উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনার মধ্যে টড সাহেব কৃষ্ণকুমারীর সম্ভাব্য উক্তির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেনঃ-

"পিতা মম,

নির্যাতন থামাও তোমার প্রতারিত হবে না আদৌ

আজ্ঞা করেছো যবে মান্য হবে তুমি

আমার এ প্রাণ সে তোমারই দান

তুমি তাকে ফিরে নিতে চাও

তোমার আদেশ, প্রত্যক্ষ, অমোঘ স্বভাবত

এ নয়ন তৃপ্ত এত এ হৃদয় এত বশীভূত

তোমারই নির্বাচিত স্বামী আমি তো করেছি বরণ

জানবো আমি, যদি হতে হয় অনুগত শিকার(তোমার)

কালশাসের তরবারে ধরে দেবো

এক নিষ্পাপ শির

তোমারই নির্দেশিত আঘাতকে সম্মান দিতে

তুমি ফিরে নাও পিতৃত্ব তোমার আমাকে যা দিয়েছো (একদা)"

এছাড়া শেক্সপীয়রের কোনো নাটকের কোনো নাটকের চরিত্রের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর নাটকের চরিত্র বিশেষে সাদৃশ্য দেখা যায়। যদিও অনেক সময়ে এই তুলনা আরোপিত সাধর্ম্যে ধনদাস দুর্বৃত্ত চরিত্র, তাই মনে হতে পারে। শেক্সপীয়রের ভিলেন চরিত্র ইয়াগোর সঙ্গে বুঝি তাঁর কোন সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মধুসূদন নিজেই পত্রে লিখেছেন, 'As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counter part of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it – which I gravely doubt! '

একমাত্র বলেন্দ্র সিংহকে মধুসূদন স্বেচ্ছায় 'কিং জন' নাটকের বাস্টার্ড চরিত্রের আদর্শে আঁকতে চেয়েছিলেন, 'I wish bullender to be serious and light like the bastard in King John' কিন্তু বাস্টার্ড চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বাধীনতা, নির্লিপ্ত দার্শনিক ভঙ্গি সরল কৌতুকপ্রিয়তা কিছুই বলেন্দ্র সিংহের লক্ষিত হয় না। মদনিকার পুরুষ বেশে উপস্থিতি শেক্সপীয়রের নাটকে পুরুষবেশে নারী চরিত্রের প্রবেশের কথ মনে করিয়ে দেয়। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকে যথাক্রমে গ্যানীমিড ও পোর্সিয়া পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে দুঃসাহসিক কাজ করেছে। সর্বোপরি ভীমসিংহ চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে মধুসূদন কিং লিয়র চরিত্র দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। লিয়রের বাৎসল্য, আবেগ, যন্ত্রণা ও পরিনামে উন্মত্ততা অনেকাংশে ভীমসিংহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'কিং লিয়র' নাটকের শেষ দৃশ্যে কন্যার মৃত্যুশোকে কাতর লিয়রের উন্মত্ত আচরণের সঙ্গে ভীম সিংহের আচরণের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তবে কিং লিয়র নাটকের ট্র্যাজিক উৎকর্ষ কৃষ্ণকুমারী নাটক

কোনো দিক দিয়েই লাভ করতে পারেনি। এবং এদিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে তুলনাও অযথার্থ।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের অলৌকিকতার ব্যবহার প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক শেকসপীয়রের পরিকল্পিত হ্যামলেটে পিতার প্রেত দর্শন ও ম্যাকবেথে ভোজ সভায় ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎকার দৃশ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তুলনা আরোপিত। কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে পদ্মিনীর আদেশ লাভ, অনেক পরিমাণে গ্রীক নাটকের দৈব্যাদেশ। গ্রীক নাট্যবিশারদ গিলবার্ট মারে মন্তব্য করেছেন – 'Heroic Saga, the normal stuff of tragedy, was all more or less supernatural, and the greeks accepted, and even enjoyed, the intrusion of frankly supernatural beings, of oracles and hieroi logoi.' কৃষ্ণকুমারী নাটকেও 'Oracles' এর ব্যবহার লক্ষ্য করি।

৬.৪ প্রাচ্য প্রভাব

'পদ্মাবতী' নাটক রচনার পর মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এরপর যদি কোনো নাটক লেখেন, তাহলে কখনই বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের নির্দেশাদি দ্বারা চালিত হবেন না। ইউরোপীয় নাটকের রূপ-রস তিনি বাংলা নাটকে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মঞ্চের প্রয়োজনে, অভিনয় উদোক্তাদের আগ্রহে এবং অবচেতন সংস্কারে – মধুসূদন ভারতীয় নাটকের প্রভাবকে পরিহার করতে পারেননি। তবে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব মধুসূদনের প্রথম নাটক দুটিতে 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে যতবেশী, কৃষ্ণকুমারী নাটকে তত বেশি নয়।

সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গরূপ কৃষ্ণকুমারী নাটকে গ্রহণ করা হয় নি। তবে মধুসূদন জানতেন যে, নাটকের সাফল্য প্রধানত অভিনয়ের মধ্যে এবং ভারতীয় হিন্দু দর্শকের বাসনালোকে যে পৌরাণিক জগত অবস্থান করছে তার সাহায্য নিয়ে আধুনিক নাটকও সহজেই দর্শক মনে রস সঞ্চার করতে সক্ষম হবে। এই জন্যই কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক নাটক হলেও, পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখে তা অনেকটা প্রাচীনত্ব লাভ করেছে। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাংকের সংলাপের মধ্যে পুরাণের কিছু কিছু উল্লেখ আমরা সংগ্রহ

করবঃ ‘এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে থাকলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?’ ‘ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কিনা?’ ‘মহারাজ আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ’ ‘যেমন পঞ্চাল দেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুল তিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসিংহও সেই রূপ হবেন’ ‘জনক রাযার কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?’ ‘লোকে বলে যে যাজ্ঞসেণী স্বয়ং পুনরায় ভূমন্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন।’ ‘যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনিই পাঠাচ্ছি।’ ‘মহারাজ নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন তার সোনার পাখা ছিল, এ দাসের কি আছে মহারাজ।’ সমগ্র নাটকে এই জাতীয় পৌরাণিক উল্লেখের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যাবে। এবং সর্বদা না হলেও অনেক ক্ষেত্রে পুরাণ ইতিহাসের পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। অপ্রয়োজনেও পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র ব্যবহার করার একমাত্র উদ্দেশ্য নাটকটি প্রাচীনত্ব দান।

সমগ্র নাটকে এই জাতীয় পৌরাণিক উল্লেখের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যাবে। এবং সর্বদা না হলেও অনেক ক্ষেত্রে পুরাণ ইতিহাসের পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। অপ্রয়োজনেও পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র ব্যবহার করার একমাত্র উদ্দেশ্য নাটকটিকে প্রাচীনত্ব দান।

এ ছাড়া ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ রচনাকালে মধুসূদনের মনে সংস্কৃত নাটকের কোনো কোনো চরিত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি নাটকে তপস্বিনীর নামকরণ করেছেন কপালকুন্ডলা। বলা বাহুল্য এই নামটি ভবভূতির ‘মালতী-মাধব’ নাটকের কাপালিকের শিষ্যা কপালকুণ্ডলার নাম থেকে নেওয়া। যদিও উভয় চরিত্রের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।

শুদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিক’ নাটকের বারাঙ্গনা চরিত্রের সঙ্গে ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের বিলাসবতী-মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়, ‘অনেক সময় বারাঙ্গনা চরিত্রেও এমন দুই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা কুল ললনারও পক্ষে অনুকরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বসন্তসেনার চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কৃষ্ণকুমারী

নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবতঃ মৃচ্ছকটিকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকার ন্যায় কৃষ্ণকুমারীর মদনিকারও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ক্রূরস্বভাবা।... কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিলাসবতীও, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায় প্রণয়াস্পদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী।

"মৃচ্ছকটিক নাটকের" ভিলেন চরিত্র রাজশ্যালক সংস্থাপকের সামান্য প্রভাব আছে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' ধনদাসের উপর। তবে ধনদাসের অনেক জীবন্ত ও সার্থক চরিত্র। সাধারণভাবে তাঁর উপর সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া পড়েছে। মান সিংহের চিত্র দর্শনে গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন, -

"Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play."

অবশ্য, পৌরাণিক কাহিনিতে যে আকস্মিকতা ও চমৎকারিত্ব থাকে, নাটকের ক্ষেত্রে তা সর্বদা সমর্থনীয় নয়। তবে মধুসূদন মনে করেছিলেন, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হিন্দু দর্শক কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়ও বিশ্বাস্য বিবেচনা করবে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রসঙ্গে পুরাণ বা সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য সূত্র নির্দেশনার মধ্যে মধুসূদনের নাট্যাদর্শের কোনো মূল রহস্য আবিষ্কৃত হয় না, সাময়িকতা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি, এই সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনায়। এইখানেই তাঁর নাট্য-প্রতিভার সীমা।

অন্যদিকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ সংস্কৃত পুরাণ বা সাহিত্যের অনুপস্থিতি নয়, সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে অস্বীকার করা। প্রকৃত প্রস্তাবে, মধুসূদন এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেননি। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' ঘটনা-বিরলতা সংস্কৃত নাটকের প্রভাবজাত না হতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য সূত্রটিও চোখে না পড়ে যায় না। মধুসূদন যে কবিত্বকে ভয় করেছেন, তারও অনুপ্রবেশ ঘটেছে বারবার। তৃতীয়াংক দ্বিতীয় গর্ভাংক

ও পঞ্চমাংক তৃতীয় গর্ভাংকে কৃষ্ণকুমারীর স্বগতোক্তিগুলি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। 'শর্মিষ্ঠা' প্রসঙ্গে মধুসূদন বলেছিলেন –

'In the Sarmistha, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere poet. I often forget the real in search of the poetical.'

কৃষ্ণকুমারী নাটকে ও ইউরোপীয় নাটয় অভীপ্সা দ্বন্দ্ব সংঘাত অপেক্ষা বর্ণনা বিবৃতিকে অধিক স্থান গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির প্রত্যক্ষ আদর্শ গ্রহণ করা সত্ত্বেও নাটকের গঠনে যে শিথিলতা লক্ষ্য করি, তা সম্ভবত সংস্কৃত নাটকের পরোক্ষ প্রভাব। জগৎসিংহ চরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্যে টাইপ নায়ক; এই বিলাসী রূপলোলুপ লঘু প্রকৃতির নায়ক নায়িকাসন্ধান, - 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ট্র্যাজিক ইন্‌টেনসিটি থেকে বঞ্চিত করেছে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' মধুসূদনের পরিণত পূর্ণ প্রতিভার প্রকাশ সত্ত্বেও, সংস্কৃত নাট্যাদর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি, এ থেকে মনে হয় নাটক রচনার ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে শৃঙ্খল মুক্তির চেষ্টা হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অবশ্যই স্মরণীয়।

৬.৫ অনুশীলনী

১)কৃষ্ণকুমারী নাটক কে কি ট্র্যাজেডি বলা যাবে ? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও।

২)কৃষ্ণকুমারী নাটককে কি বিয়োগান্ত বলব নাকি ট্র্যাজেডি? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৩)কৃষ্ণকুমারী নাটকে কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রভাব কাজ করে গেছে আলোচনা কর।

৪)ঘটনা পরম্পরার বিবরণের ভিতর দিয়ে নাটকটি কেমন ভাবে এগিয়ে গেছে ব্যক্ত কর।

৫)কৃষ্ণকুমারী নাটকে প্রাচ্য প্রভাব কতখানি? তোমার অভিমত পরিবেশিত কর।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকুমারী নাটক- অলোক রায় সম্পাদিত।

একক ৭ কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি

বিন্যাসক্রম

৭.১ গদ্যশিল্পী মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ

৭.২ কৃষ্ণকুমারী নাটকের চরিত্রসৃষ্টি

৭.৩ অনুশীলনী

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৭.৫ উপসংহার।

৭.১ গদ্যশিল্পী মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ

বাংলা গদ্যের জন্মলগ্ন থেকে দুটি ধারা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে, - সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রয়াস-প্রযত্নের মধ্য দিয়ে যাদের দূরত্ব কমাবার চেষ্টা লক্ষ্য করি। একটি তৎসম শব্দবহুল সমাসাড়ম্বরপূর্ণ গদ্যরীতি – মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে তারাশংকর তর্করত্ন পর্যন্ত গদ্যশিল্পীদের রচনায় যার ব্যবহার। অন্যটি একেবারেই দেশি-বিদেশি, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দবহুল আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি সর্বস্ব কথ্য গদ্যরীতি, উইলিয়ম কেরীর ‘কথোপকথন’ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোমপ্যাঁচার নক্সা’ পর্যন্ত গদ্যরচয়িতাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় যার ব্যবহার। আবার একই লেখকের হাতে দুরকম গদ্যের নির্দশন পেয়েছি; মৃত্যুঞ্জয় কথ্যভাষা প্রয়োগে অসমর্থ ছিলেন না; উইলিয়ম কেরী ‘ইতিহাসমালা’ গ্রন্থে কিংম্বা কালীপ্রসন্ন মহাভারতের অনুবাদ গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী গদ্যব্যবহারে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ - এ এই দুই ধারার গদ্যের মিশ্রণ চেষ্টা লক্ষ করি, কিন্তু প্যারীচাঁদের সেই ক্ষমতা ছিল না যাতে এই দুই গদ্য ধারার সমন্বয়ে সাহিত্যিক চলিত ভাষার সৃষ্টি করতে

পারেন। ফলে তাঁর গদ্য একদিকে আঞ্চলিকতা দোষদুষ্ট, অন্যদিকে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে অসতর্ক। এবং সে ভাষা অনেকাংশেই মুখের ভাষা নয়; কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা মাত্র। সেদিক দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যে সাধুভাষার গঠন বযায় রেখে, তাকে সরলতা, স্বচ্ছতা, ছন্দগুণ এবং লালিত্য দানে অপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে আরও কিছুদূর এগিয়ে দিলেন, ভাষাকে বিচিত্র-ভাবনা প্রকাশে সক্ষম করে তুললেন। আধুনিককালে ব্যবহৃত সাধুভাষার সাহিত্যিক রূপ তাঁরই দেওয়া। কিন্তু মুখের ভাষা তখনও সাহিত্যিক ভাষা হয়ে ওঠেনি – কথ্যভাষার কোনো সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় নি। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থে আদ্যন্ত কথ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এবং গ্রন্থটির সাহিত্যিক গুণও স্বীকার্য। তবে রবীন্দ্রনাথ এর পর বহুদিন উপন্যাস বা প্রবন্ধ রচনায় পুরোপুরি কথ্যভাষা প্রয়োগ করেননি; ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশের পর সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রমথ চৌধুরী কথ্যভাষার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব – ভার গ্রহণ করলেন।

প্রবন্ধ বা কথাসাহিত্যে গদ্যরীতির দুটি ধারা বহুদিন সমান্তরাল গতিতে এগিয়েছে; আসলে কথ্যরীতির গদ্য রূপান্তর লাভ করেছে। এর কারণ নাটকে ব্যবহৃত গদ্য চরিত্রের মুখে বসবে, ভাষা জীবন্ত হলে তবেই চরিত্র জীবন্ত হবে, - এবং 'মুখের কথাই জীবন্ত'। আদি যুগে যারা নাটক লিখেছেন, তাদের পক্ষে এ কাজ আদৌ সহজ ছিল না। ১৮৫২ সালে যখন প্রথম বাংলা নাটক প্রকাশিত হল, তখনো 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৭) কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'(১৮৬১) রচিত হয়নি। ফলে নাট্যকারদের সামনে গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না। যারা অনুবাদ-নাটক লিখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। এবং অনেক সময়ে সে সব নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। অনেকে এই জন্যই গদ্য এবং পদ্য দুই-ই ব্যবহার করেছেন, একই নাটকের মধ্যে। হরচন্দ্র ঘোষের নাটকগুলির 'উৎকট গদ্যরীতি' প্রসঙ্গত মনে পড়বে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রথম নাট্যমঞ্চে অভিনয় উপযোগিতার কথা ভেবে নাটকে সংলাপ ব্যবহার করেছেন (যদিও সেদিন তাঁর সব নাটক অভিনীত হয়নি) ; এবং তাঁর গদ্য

স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাবে চরিত্রের মুখে উপযুক্ত হয়েছে। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে অভিনয়- সাফল্য লাভ করে, তাঁর অন্যতম কারণ সংলাপের ভাষা। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'রত্নাবলী' নাটকের অংশঃ-

রাজাঃ (সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছদন পূর্বক) এস্ এস্ – সুসঙ্গতা- তবে- তবে – আমি এখানে আছি, মহিষী কি জানতে পেরেছেন?

সুসঙ্গতা। হ্যাঁ মহারাজ। তিনি জেনেছেন, আবার আমিও ঐ চিত্রপটের কথটা বলি গে।

বিদূষক। মহারাজ। ও মাগি ভারি দুশঠ, ও না পারে এমন কর্ম নেই, আপনি ওকে কিছু দিয়ে-

রাজা। (সভয়ে সুসংতার হস্ত ধরিয়া) সখি। তুমি একথা মহিষীকে বোলো টোলো না – আমার দিব্য।

সুস। (সহাস্য মুখে) না মহারাজ! দিব্য দিবেন না; আমি পরিহাস করলেম – একি বলবার কথা?

রাজা। (সহাস্য মুখে) তাই তো বলি এ কর্ম কি তোমার যোগ্য, এ আংটি পরো – (হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান)

সুস। (সহাস্য মুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না – আমার সখী সাগরিকা আমার উপর রাগ করেছেন, কথা কন না, আমি সাধ্য-সাধনা কল্যেম। কিছুতেই হোলো না, তা আপনি বরং তাকে এট্টু বলে কয়ে দিন, তা হলেই আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

রাজা। (সোৎসুকে) কি বল্ল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী? কৈ? তোমার সখী কোথায়?

সুস। ঐ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত ডাকলেম্ - বলি ঘরের ভিতর আয় – তা কোন মতেই এলো না।

রাজা। (সত্বর আসিয়া দেখিতে স্বগত) এই সেই সাগরিকা, আহা মরি মরি এমন রূপ (প্রকাশ্যে) সুসঙ্গতা তোমার কি অদৃষ্ট – তুমি এমন সখী কোথা পেলে? আহা! রূপ

দেখে আমার নয়ন জুড়াল, বোধহয় বিধাতা একে নির্মাণ করে আপনিই মুগ্ধ হয়ে থাক্‌বেন।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বলেই এর মধ্যে মাঝে মাঝে তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, নাট্যকার সংলাপকে যতদূর সাধ্য বাস্তবানুগ করার চেষ্টা করেছেন, এবং রাঢ় অঞ্চলের কথ্যভাষাই এর ভিত্তিভূমি। মধুসূদন 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথম বাংলা নাটক লেখার কথা ভাবেন, এবং 'রত্নাবলী'র গদ্য ও তাঁর সংলাপ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হন। ১৮৫৯ সালে মধুসূদন যখন শর্মিষ্ঠা নাটক লিখলেন, তখন রামনারায়ণের নাটকের ভাষাই তাঁর আদর্শ ছিল।

কিন্তু তুলনায় দেখবো তর্করত্ন মহাশয়ের গদ্যের থেকে মধুসূদনের গদ্য অনেক বেশি তৎসম শব্দবহুল; অন্তত 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' রচনাকালে মধুসূদন ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার করলেও মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে সংলাপ রচনা করতে পারেননি। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্‌ঃ-

বিদূষক। মহারাজ। এই দেখুন, ইনিই কাম-সরবোরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হোউক(প্রনাম)

রাজা। কল্যাণি! তুমি চিরকাল সধবা থাক।(বিদূষকের প্রতি) সখে! এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ! ইনি স্বয়ং ঊর্বশী, ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য! তুমি যে একেবারে রসিক চূড়ামণি হয়ে উঠলে।

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাক্ষণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে, তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এর দিকে দেখুন দেখি।

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাতিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধু পান ত্যাগ করে? বয়স্য, আপনি একবার এর একটি গান শুনুন!(নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি! তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্তিনী। (২/২)

বাংলা গদ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের সাধারণ ধারণা কি ছিল, তা তাঁর জীবনী থেকে জানতে পারি। "একদিন প্যারীচাঁদ মিত্র – বাংলা সাহিত্যের টেকচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মধুর বাংলা ভাষা লইয়া তর্ক বাঁধিয়া উঠিল। মধু বলিলেন – 'এ আবার আপনি কি আরম্ভ করলেন! মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে সাহিত্যের মহিমা খর্ব করতে যাচ্ছেন।' টেকচাঁদ বলিলেন, 'তুমি বাংলা ভাষার কি বুঝবে? তবে জেনে রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনাপদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে নির্বিবাদে চলবে।' মধুসূদন ভাষার পোষাকী ধরণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, ভাষার আটপৌরে চালের প্রশংসা শুনিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, 'সংস্কৃত থেকে যতদিন না প্রচুর আমদানি করছেন, ততদিন এ ভাষা মেছুনীদের ভাষা বই আর কিছু নয়।' তারপরে ভবিষ্যৎ ভাষণের গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিলেন, 'দেখবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করব, তাই চিরস্থায়ী হবে।' (প্রমথনাথ বিশী – মাইকেল মধুসূদনের জীবনভাষা)"

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র মঙ্গলাচরণ, মধুসূদনের বাংলা ভাষায় লেখা দু-একটি পত্র এবং বিশেষ করে 'হেক্টর বধে'র গদ্য পড়লে মনে হয়, কাব্যের মতোই মধুসূদন গদ্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যে অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং সেইজন্যই 'মুখের ভাষা'কে তিনি সাধ্যমতো পরিহার করেছেন।

কিন্তু নাটক লেখার সময়ে ভাষাগত এই একই আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এইখানেই মধুসূদনের স্ববিরোধ এবং তিক্ত দ্বিধা। চরিত্রকে সজীবতা দিতে হলে, তাঁর মুখে জীবন্ত ভাষা বসাতে হবে, - তা 'মেছুনিদের ভাষা' হলেও। মধুসূদন বোধ হয় মনে করতেন লঘুভাব-সৃষ্টির জন্য গদ্যকে কথ্যভাষার অনুগামী করলে দোষ হয় না। - 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটিতে ভাষা সকল

পান্ডিত্যভিমান ত্যাগ করেছে। 'আলালের ঘরের দুলালে'র থেকেও ভাষা সেখানে সহজ এবং প্রাণবন্ত। কিন্তু গম্ভীরভাবে প্রকাশ করার পক্ষে 'মুখের ভাষা'কে মধুসূদন উপযোগী বিবেচনা করতেন না; বিশেষ করে 'ট্র্যাজিক ইন্‌টেনসিটি' ফোটাবার জন্য মধুসূদন গদ্যকে যথাসাধ্য অলংকারমন্ডিত সংস্কৃত শব্দ ও আড়ম্বর যুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। মধুসূদনের এই দ্বিধা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মধুসূদনের নাট্যবোধ ছিল না, এমন নয়। আমরা বারবার বলেছি, মঞ্চের দিকে তাকিয়েই তিনি নাটক লিখেছেন। সংলাপ কেমন করে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে তা তিনি জানতেন। তাঁর প্রমাণ বিশেষ করে ধনদাস ও মদনিকার সংলাপ। ভাষা সেখানে সকল জড়তা ত্যাগ করছে। কিন্তু ভীম সিংহ, তপস্বিনী এবং কৃষ্ণকুমারীর মুখে যে - ভাষা বসানো হয়েছে, তা অধিকাংশ সময়েই কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক। মধুসূদন 'ট্রাজিক্ রিলিফের' ক্ষেত্রেই শুধু ভাষাকে সরল ও প্রত্যক্ষ করতে রাজি ছিলেন, 'ট্র্যাজিক ইন্‌টেন্সিটি'র ক্ষেত্রে ভাষাকে করে তুলতেন জটিল ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ।

যখন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখেছেন, তখনই মধুসূদন জানতেনঃ-

'the only fault found with it, that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronize it.'

অবশ্য 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে মধুসূদনের ভাষাজ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ, অপ্রয়োগসিদ্ধ। 'পদ্মাবতী' তে কোনো উন্নতি দেখা গেল না। বরং আরও ভারগ্রস্ত হওয়ার ফলে গতি অনেকটা হারাল। 'পদ্মাবতী'র বিষয় গম্ভীর ও সমুন্নত। কিন্তু এই সঙ্গে লেখা প্রহসনের ভাষা সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে অবস্থান করছে।

এরপর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। মধুসূদন প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেনঃ-

'Lord! What a romantic Tragedy it will make!'

শেক্সপীয়রের নাটক এবং তাঁর ভাষা, তাঁর আদর্শ। নীতিগতভাবে ভাষাকে তিনি কথ্যরীতির অনুগামী করতে চেয়েছেন; প্রবাদ – প্রবচন ও বাঙালীর বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গির অনুসরণে সংলাপকে তিনি সজীব করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকুমারী দুই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যথাঃ-

ধনদাস। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদনিকা। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ – কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কানে খাট বটে? – বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ – বিলাসবতী কে?

মদ। হাঁ! হাঁ! বিলাসবতী কে, তা আপনি জানেন না? হাঁ! হাঁ! হাঁ!

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্থেকে শুনলে?(প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করে জানবো?

মদ। আঃ আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) একথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যাঁ দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি জা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি তো ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনীদেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন, আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুন্ডাররূপে গর্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দবগুণ ক্রোধান্বিত

কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা মার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না?(ঊর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর।...

অথবা,

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃদকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ একি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্বতের ন্যায় অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে। আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আঁকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে।...

স্বীকার করি, এ দু'জাতীয় ভাষাই ক্ষেত্র বিশেষে সুপ্রযুক্ত; কিন্তু মধুসূদন তখনো পর্যন্ত নাটকের সংলাপ রচনার জন্য কোনো আদর্শ ভাষা সৃষ্টি করতে পারেননি। এছাড়া, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ, ব্যাকরণগত অশুদ্ধ পদ প্রভৃতিও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারেননি। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সাফল্যের তুলনায় এ সবল ত্রুটি নিতান্ত সামান্য। মধুসূদন অত্যন্ত অল্প সময়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর সামনে বাংলা নাট্যসংলাপের কোনো আদর্শ ছিল না, বাংলা ভাষা ছিল দুর্বল ও জড়তাগ্রস্ত – এ সব কথা মনে রেখে মধুসূদন গদ্য এবং নাটকের সংলাপ বিচার করলে, তাকে সাধুবাদ না দিয়ে উপায় নেই।

৭.২ চরিত্রসৃষ্টি

আধুনিক যুগে যে চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উপন্যাসে বা নাটকে, তাঁর সঙ্গে মধ্যযুগের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সর্বদাই যে গুণগত এমন নয়; তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য অবশ্যও স্বীকার্য। মধ্যযুগে মানুষের ব্যক্তি পরিচয়ের স্বীকৃতি ছিল না; রেনেসাঁসের সময়েই মানুষের সর্বাঙ্গীণ প্রাধান্য ও স্বতন্ত্র সর্বজন স্বীকৃত হল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ রাবণ চরিত্রের এখানেই প্রকৃতিগত বৈষম্য। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল নরনারী সৃষ্টি করেছেন; ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’র চরিত্র গুলিকেও নূতন সৃষ্টি বলে গণ্য করতে পারি।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের নায়ক ভীমসিংহ। তিনি নাটকের অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাব। তাকে অবলম্বন করে শোক ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অবশ্য ইতিহাসে তাঁর যে প্রাধান্য, এখানে তা রক্ষিত হয়নি।সমগ্র জীবন ব্যাপি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে সংগ্রামের পরিচয় নেই,- সংগ্রাম পর্যুদস্তহীন ভীম সিংহকেই এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। তিনি যেন শান্ত, কর্মবিমুখ এক রাজপুত বৃদ্ধ। ট্র্যাজিক নায়কের পূর্ণ মহিমা থেকে এর ফলে তিনি কিছুটা বঞ্চিত হয়েছেন, প্রতিরোধ শক্তির অভাবে তিনি দুর্বল চরিত্রের মানুষ বলে প্রতিভাত হয়েছেন। হয়তো এইখানেই কিং লিয়রের সঙ্গে তাঁর আপাত সাদৃশ্য। কিন্তু রাসিনের ইফিজেনি নাটকের পিতা আগামেম্ননের সঙ্গে তাঁর কোনো দূর সাদৃশ্যও নেই, - আগামেমনন ট্রোজান যুদ্ধের সেনাপতি; ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও জয়লাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাৎসল্যের প্রবল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত; এবমগ শেষ পর্যন্ত বাৎসল্যের পরাজয়ে ট্র্যাজেডির নায়ক। ভীম সিনহ চরিত্রে মন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করা হয় নি। একবার মাত্র তাঁর আভাস আছে –

রাজাঃ (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয় – না, - তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যা পাপ গ্রহণ করা । বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমুহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না না – কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্বনাশ। উঃ – না- না

(গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্মে সম্মত হতে পারি? (৫/১)

এবং এর সামান্য পরেই রাযার ‘মূর্চ্ছা প্রাপ্তি’। পরবর্তী কয়েকটি দৃশ্যে রাযার চেতনালোপ ট্র্যাজেডির তীব্রতা হ্রাস করেছে।

তবে উত্তর- মধুসূদন অনেক বাংলা নাটকেই ভীম সিংহ চরিত্র অন্য নামে ঘুরে ফিরে এসেছে, - কখনও লক্ষ্মণ সিংহ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সরোজিনী"নাটকে) কখনও সাজাহান(দ্বিজেন্দ্রলালের), কখনও যোগেশ, (গিরিশচন্দ্র, প্রফুল্ল নাটকে) নামে।

ভীম সিংহকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' নায়ক বলতে অনেকের আপত্তি আছে। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে নায়িকা বলতে আশা করি কারো কোন আপত্তি হবে না। কৃষ্ণকুমারী সরলতার প্রতিমূর্তি – এই দিক দিয়ে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। কৃষ্ণকুমারীর জীবনে যে বিষাদান্ত পরিণতি নেমে এল, তাঁর জন্য কৃষ্ণকুমারী নিশ্চয় দায়ী নয়। কোনো পাপ বা ভ্রান্তি('হ্যামারসিয়া') তাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। মদনিকার চাতুর্যে মানসিংহের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং মান সিংহকে তাঁর প্রেমপত্র লেখা- 'ভ্রান্তি('হ্যামারসিয়া'), বলা যায় না। ইওউরিপিদিস বা রাসিনের নাটকে ইফিজেনিয়া যতটা ফুটেছে – প্রধানত অনিচ্ছাকৃত আত্মবিসর্জনের জন্য, কৃষ্ণকুমারীর স্বেচ্ছাকৃত আত্মদানই সেই যন্ত্রণার মর্মদায়ী অভিব্যক্তি সম্ভব হয়নি।

তবে কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বিষাদ মগ্নতা লক্ষ করি – সে যেন জানে জীবন কখনই সুখের হতে পারে না। সমালোচকেরা অনুমান করেছেন, আত্মহননের ইচ্ছা তাঁর মনের মধ্যে অনেক আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল, - স্বপ্নে পদ্মিনীর আদেশ প্রাপ্তির মধ্যে সেই মগ্ন ইচ্ছারই প্রকাশ। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' একমাত্র কৃষ্ণকুমারীর মধ্যেই যেন কিছুটা মানবরসের অভাব লক্ষ করি, - কৃষ্ণকুমারী যেন রোমান্সের নায়িকা। অবশ্য মধুসূদন সচেতন ভাবে নাটকের মধ্যে কয়েক যায়গায় কৃষ্ণকুমারীকে করুণ কাতর হৃদয়াবেগ সমৃদ্ধ করে, এক স্নিগ্ধ চরিত্র নারী রূপে এঁকেছেন।

যেমন – 'উঃ কি ভয়ঙ্কর ঝড় হচ্ছে। আজ এ কি মহা প্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্বতের ন্যায় অটল। প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মতো ছোট ছোত ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে!' (৫/৩)

চিত্র দর্শনে কৃষ্ণকুমারীর পূর্বরাগ দৃশ্যটি পরবর্তীকালে অনেক ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারকে অনুরূপ দৃশ্য পরিকল্পনায় উত্তেজিত করেছে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ

উপন্যাসে তসবীরওয়ালির কাছ থেকে রাজসিংহের চিত্র ক্রয় ও চঞ্চলকুমারী পূর্বরাগ; ভিন্নতর পরিবেশে দ্বিজেন্দ্রলালের মেবারপতন নাটকে কল্যাণী কর্তৃক মোবারকের চিত্র ক্রয় এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া। কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রভাবে ও কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের আদর্শে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সরোজিনী নাটকে সরোজিনী চরিত্র সৃষ্টি করেন। সরোজিনীর পরিনাম মিলনান্ত। ভীমসিংহকে যারা নায়ক মানতে অনিচ্ছুক, তাঁরা জগৎ সিংহকে নায়কত্বে বরণ করেছেন। জগৎ সিংহকে নিয়েই কাহিনির সূচনা। বিলাসী, ভোগলিপ্সু, রাজকর্মে অবহেলাপরায়ণ – জয়পুরের জগৎ সিংহ। মধুসূদন পত্রে জগৎ সিংহের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন –

"I have tried to represent juggut singh as I find him in history, a some what silly and voluptuous fellow."

জগৎ সিংহ নাটকের মধ্যে বেশি অংশেই ধনদাসের দ্বারা চালিত হয়েছেন। এবং প্রথম থেকেই মনে হতে থাকে তিনি কিছু নির্বোধ প্রকৃতির অথবা একান্তভাবেই রূপ-লালসা চালিত, যার জন্য ধনদাসের কৌশলের কাছে তিনি শিশুর মতো আচরণ করেছেন। এমন কি চতুর্থাংকে যখন মন্ত্রী বার বার চেষ্টা করেছেন রাজাকে সচেতন করেছেন ধনদাস সম্পর্কেচ সাবধান থাকতে তখনও রাজার জ্ঞান উদয় হয় না। বিলাসবতীর সঙ্গে জগৎ সিংহের ব্যবহারেও চতুর নাগরের কোনো পরিচয় নেই। জগৎ সিংহ এক রঙা চরিত্র, - সমতল সদৃশ মসৃণতা আছে, বন্ধুরতার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। জগৎ সিংহের আকস্মিক জ্ঞানদয়ও অপ্রত্যাশিত এবং পূর্বাপর সংগতি রহিত। ধনদাসের চাতুর্যের কথা মন্ত্রীর মুখের শোনামাত্র তিনি বলেন "বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই।"

জগৎ সিংহ চরিত্রটির ও নাটকীয় কিছু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু মধুসূদন এই চরত্রটির প্রতি আদৌ মনোযোগ দেননি।

এ দিক দিয়ে বলেন্দ্র সিংহ চরিত্রটিকে অনেক সার্থক বিবেচনা করি। তবে জাবৎ সমালোচকেরা এই চরিত্রটির প্রতি কিছু অবিচার করেছেন; তাদের মতে 'এই বলেন্দ্র সিংহ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, কৃষ্ণকুমারীর হত্যাকে ভ্রাতার আদেশ বিবেচনা করিয়া বিনা

দ্বিধায় এই জঘন্য কার্যে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তারপর কৃষ্ণকুমারীর নিকট যখন ধরা পরিয়াছে, তখনও নিঃসংকোচে এই কার্যে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে গিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতার নির্দেশেরই উল্লেখ করিয়া দিয়াছে। একটু নির্বোধ সরলতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বলেন্দ্র সিংহ সত্যই সরল-ব্যক্তিত্বের মানুষ নন, রাণা ভীম সিংহের প্রতি তাঁর আণুগত্যও প্রবল, 'মহারাজের কিংবা স্বদেশের হিতসাধনের যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি (৫/১)'

অন্যদিকে ভ্রাতুষ্পুত্রী কৃষ্ণকুমারী তিনি অশেষ স্নেহ করেন, তাঁর অমঙ্গলে তিনি কাতর। বলেন্দ্র সিংহের দ্বিধা ও যন্ত্রণা তাঁর প্রত্যেকটি উক্তির মধ্যে ফুটেছে। 'তুমি বল কি, মন্ত্রী? তুমি কি চন্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম? এ কলঙ্ক সাগরে ,মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন করতে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেব বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা আমি কেমন করে নিরপরাধে তাঁর প্রাণ বিনষ্ট করি? – ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে কেননা, পরকালে যে কি ঘটবে, তা নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্মের প্রতিফল কি হইকালে ভোগ করতে হয় না?' (৫/২)

যে দৃশ্যে বলেন্দ্র সিংহ খড়গ হস্তে কৃষ্ণকুমারীকে বধের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে, সেখানে বলেন্দ্র সিংহের একবার এগিয়ে যাওয়া ও পরমুহূর্তেই পিছিয়ে আসার মধ্যে তাঁর দ্বিধা ও দ্বৈততা প্রকাশ পেয়েছে। কতর্ব্য ও স্নেহের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বলেন্দ্র সিংহ এই নাটকে যে সজীবতা লাভ করেছে, সমগ্র নাটকের মধ্যে অন্য কোনো চরিত্রে তাঁর তুলনা নেই। অবশ্য মধুসূদন তাকে অল্প পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তা না হলে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' এই গৌণ চরিত্রটি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রে আরও একটি দিক আছে, যা তাঁর প্রথম আবির্ভাবে একবার মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাইরে কখনও লঘুই প্রকৃতির, জয়পুর ও মরুদেশের দূতদের কথোপকথনে তিনি অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভিতরের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি, সেখানে তিনি গম্ভীর ও যন্ত্রনা কাতর ।

অন্তর ও বাহিরের দৈত্য পরিচয়ে বলেন্দ্র সিংহ যে ব্যক্তিত্ব লাভ করেছেন তা বিচিত্র বর্ণে সমুজ্জ্বল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে ঘটনার গতি প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করেছে অলক্ষিত দৈব শক্তি- কিন্তু মঞ্চে যারা সবচেয়ে সজীব, চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে যাদের অপার উদ্যম, অনৈতিহাসিক চরিত্র হয়েও যারা মূল কাহিনিকে অনেক পরিমানে পরিচালিত করেছে, তাঁরা হল – ধনদাস ও মদনিকা। জগৎ সিংহের যাবতীয় দুষ্কর্মের সহায় ও স্তাবক ধনদাস। আবার ধনদাসই কৃষ্ণকুমারীর চিত্র এনে জগৎ সিংহের মনে রূপ লালসা সৃষ্টি করেছে, এবং তার ফলে কৃষ্ণকুমারীর জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। ধনদাসের উদ্দেশ্য অবশ্য অতি সামান্য, - অর্থপ্রাপ্তি ও বিলাসবতীকে আয়ত্ত করা। কৃষ্ণকুমারীর ক্ষতি সে করতে চায় নি; কিন্তু অর্থের জন্য তাও করতে সে বিমুখ হত না। সততা, কৃতজ্ঞতা, নীতিবোধ কিছুই তাঁর নেই। তাঁর জীবনদর্শন ভারী চমৎকার - 'আরে একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতুক দোষারোপ করতে হয়; কারো বা দুটো অশক্ত কথায় মনও রাখতে হয়, আর কারো মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই তো সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ যেমন করেই হউক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চায়; তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ?' (১/১)

এই ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়েই ধনদাস জিততে চেয়েছে। জগৎ সিংহকে কৃষ্ণকুমারীর প্রতি অনুরক্ত করার পিছনে অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হল নিরাশ্রয় বিলাসবতীকে লাভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনদাসের হার হল; বুদ্ধি খেলায় সে হেরে গেল। তার সকল চেষ্টা বিফল হল। তাকে একদিন এ জাতীয় আত্মবিশ্লেষণও করতে হয়েছে, 'আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্মের প্রতিফল এই রূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভ মদে মত্ত হলে লোকের কি জ্ঞান থাকে? এই লোভ মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই।(রোদন)। প্রভু আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর।(৪/৩)'

ধনদাসের এই পরিবর্তন মনস্তত্ত্ব কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয় উঠবে। কিন্তু তাঁর থেকেও বড় প্রশ্ন, মধুসূদন ধনদাস চরিত্রের এই পরিবর্তনকে অনিবার্য বলে মনে করলেন কেন? নীতি উপদেশ দেওয়ায় কি মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল? শিল্পীর যে নিরাসক্তি, যে নির্মমতা মধুসূদনের অন্যান্য চরিত্র রচনায় লক্ষ্য করেছি, ধনদাস চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ধনদাসের নীচতা ও ক্ষুদ্রতাকে তিনি নিজে ক্ষমা করতে পারেন নি, সেই জন্য বিধাতার কাছে তাকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়েছেন। অথচ ধনদাস চরিত্রের অন্যতর নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল। ধনদাস চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুর্বৃত্ত (ভিলেন) চরিত্রের যে আদর্শ তিনি স্থাপন করতে পারতেন, তা তিনি করলেন না। ফলে কৌতুক সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই ধনদাস সৃষ্ট করতে পারল না।

কৃষ্ণকুমারীর শোচনীয় পরিণতিকে তরান্বিত করতে ধনদাসের থেকে মদনিকায় বেশি সক্রিয় সফল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সে কৃষ্ণকুমারীর নামে রাজা মানসিংহকে জাল প্রেমপত্র লিখেছে; রাজা মানসিংহের জাল চিত্রপট -

‘এ ত মানসিংহের কোন পুরুষের প্রতিমূর্তি নয়। নাই বা হোল বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হউক না কেন, ইঁদুর ধরতে পারলেই হয়।’(২/৩) দিয়ে কৃষ্ণকুমারী কে প্রতারিত করেছে; ধনদাস ও মরুদেশের দূতের মধ্যে বিবাদ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কাজ গুলি নীতি সংগত এমন বলতে পারি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদনিকার প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি অতি প্রগাঢ় হওয়ার ফলে তাঁর প্রতি দর্শক কোনো বিদ্বেষ অনুভব করে না। এবং এই সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, মদনিকার অন্তর্জগতের রূপায়ণে(ধনদাসের অন্তর্জগত কিন্তু অপ্রকাশিত থেকেছে।) মদনিকা বিলাসবতীর সখী,- যে বিলাসবতী রূপজীবিনী, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে মদনিকা যা কিছু করেছে মদনিকা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করেননি, করেছে বিলাসবতীর শুভকাঙ্ক্ষী হিসেবে। বিলাসবতীর দুঃখে তাঁর দুঃখবোধ স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। কৃষ্ণকুমারীর বিপদ আশঙ্কা করেও সে কাতর, ‘বাঃ কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুণ যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘ্যাত না জন্মে। ভাল বলে এও ত বড় আশ্চর্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতোন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার

পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?' (৩/১)

অন্যত্র - "হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুণ লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে, এ সুলোচনা কুরঙ্গিনীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমি একে কৃপা কর।"(৩/১)। এই খানেই মদনিকা চরিত্রের বিশিষ্টতা। মদনিকা নিজের বুদ্ধির সম্বন্ধে গৌরব বোধ করে, ধনদাসকে পর্যুদস্ত করায় তার পরম আনন্দ। এ পর্যন্ত সহজেই বোঝা যায়; কিন্তু শুধু বুদ্ধির গৌরবই আর একমাত্র গৌরব নয়, হয়তো তাঁর নিজের অজ্ঞাতে বারবার হৃদয়ের গৌরবও প্রকাশ পেয়েছে এবং এই উভয়ের মিশ্রণেই মদনিকা অসামান্যা হয়ে উঠেছে। হতবুদ্ধি ধনদাসের অনুশোচনার দৃশ্যটি নাটকের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলেও, মদনিকাকে আর একবার মঞ্চে উপস্থিত করার লোভেই মধুসূদন দৃশ্যটির পরিকল্পনা করেছেন, বেশ বোঝা যায় যে, ধনদাস কে করার জন্য মদনিকার এত শ্রম, সেই ধনদাসের দুঃখ দেখেও মদনিকা ব্যথিত 'তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলব? ধনদাস, আমি ভাই সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার নারীর প্রাণ বটে – হাযার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। (৪/৩)'।

মদনিকা ন্যায় পথে, সত্য পথে না চললেও তাঁর অন্তরে কিছু সৎগুণ লুকিয়ে ছিল, - 'There is some soul of goodness in things evil, would men ovservingly distil it out'. এখানেই কৃষ্ণকুমারী নাটকে সমালোচনা ও একটি গুরুতর ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েছে। তাদের মতে, 'মদনিকা চরিত্র মধুসূদনের প্রিয় ছিল বলিয়া সে গুরুতর অন্যায় সত্ত্বেও যে পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোনো শাস্তি দেন নাই, অথচ ব্যর্থ ও বিফল ধনদাসকে অপমানিত, শাসিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছেন। মদনিকার প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু ধনদাস নিজে অর্থাৎ ধনদাসের মধ্যে 'We are shown a thing absolutely evil, and what is more dredful power.' এবং এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, মদনিকা কেন মধুসূদনের বেশি প্রিয় ছিল।

অঘটন - ঘটন পটীয়সী মদনিকা চরিত্রের প্রভাবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের নির্মলকুমারী চরিত্র অঙ্কিত হয়। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে দরিয়াবিবি চরিত্রের মধ্যেও এর অলক্ষ প্রভাব আছে।

মদনিকা যার সহচরী, সেই বিলাসবতী কিন্তু নাটকে ততখানি পরিস্ফুট হবার সুযোগ পাই নি। মধুসূদন এই চরিত্রটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। বিলাসবতী রাজা জগৎসিংহের রক্ষিতা, ইতিহাস থেকেই চরিত্রটিকে আহরণ করা হয়েছে। মধুসূদন এক পত্রে লিখেছেন,-

'I think we may bring her in and allow her jealousy – full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine – though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes.'

বিলাসবতী চরিত্র প্রসঙ্গে যে কথাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হল রাজা জগৎ সিংহের প্রতি তাঁর প্রেমের একাগ্রতা ও গভীরতা। প্রণয় ব্যবসায়ী জগতসিংহ তাকে চিরকাল ভালোবাসবেন না, তা সে জানে। কিন্তু যে প্রেম একদিন দিয়েছে, তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, 'ভাল আমি এ লম্পট জগৎ সিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন?' এ নব - যৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করব, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমি আবার তাঁর দাসী হলেম যে।'(১/২)। কৃষ্ণকুমারী নাটকে প্রেমের গভীরতা ও তীব্রতা একমাত্র বিলাসবতীর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, এবং মধুসূদন যখন এই চরিত্রটি রচনা করেছিলেন, তখন রূপোপজীবিনী নারীর মহিমা প্রদর্শন অপেক্ষা, প্রেমের মহিমায় প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। বিলাসবতী স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত চরিত্র – বাইরে সে রাযার রক্ষিতা, কিন্তু অন্তরে সে প্রেম ও ঐশ্বর্যে বরণীয়া। জগৎ সিংহের বিবাহ উদ্যোগে সে কাতর, আবার তাঁর যুদ্ধ দমনে চোখের জলে অন্ধ। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর সরলতার সঙ্গে বৈপরীত্য হিসেবে বিলাসবতীর ছলাকলাকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাটকে কৃষ্ণকুমারীই বরং অনেকটা স্থিরবৎ একরঙা চিত্র, - রোমান্সের পটে যার অবস্থান; অন্যদিকে বিলাসবতী কোনো ছলাকলা

প্রকাশ না করেও, হৃদয় স্পন্দনের দোলায় জীবন্ত রক্তমাংসের নারী রূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত। বিলাসবতী জাতে অতিরিক্ত প্রাধান্য না পাই, তাঁর জন্যে মধুসূদনকে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হয়েছে, এবং নাটকের মূল ঘটনা ধারা থেকেও তাকে যথাসাধ্য বিযুক্ত রাখা হয়েছে। তবু বিলাসবতী স্বল্প পরিসরে নাটকের দর্শকদের মন হরণ করে নেয়।

এছাড়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' আর দুটি নারী চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ ভীমসিংহের মহিষী অহল্যা দেবী এবং তপস্বিনী। এই দুই চরিত্রকেই সমালোচকেরা প্রাণহীন ও ব্যর্থ সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন; শুধু তাই নয়, অহল্যা দেবী ও তপস্বিনীকে নাটকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। মধুসূদন নিজে কিন্তু চরিত্র দুটিকে নাটকের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন, 'But if you Examine the one synopsis forwarded by me, carefully, you will find the queen a very necessary character – so also the তপস্বিনী' এ ব্যাপারে মধুসূদন অনেক চিন্তা করেছিলেন, এবং তিনি দেখেছিলেন, কৃষ্ণকুমারী চরিত্রকে প্রকাশ করতে গেলে আরও দুএকটি নারী চরিত্রের একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমাদের সমাজ কোনো নারী, নিজের পতি, ভ্রাতা বা পিতা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ফলে, নাটকের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একাধিক নারী চরিত্রের প্রয়োজন।

রাণি অহল্যাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন মন্তব্য করেছেনঃ- 'The queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem sing. Can not but be sad and grave.' ভীমসিংহ তাঁর রাজত্বকালে একের পর বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন; এবং সেই দুর্যোগের অভিঘাত রাণীকেও স্পর্শ করেছে – নাটকে তাঁর প্রথম উক্তি, 'ভগবতী, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি সে কেবল ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে বৈত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।' (২/১)।

রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কন্যা কৃষ্ণকুমারীর দুর্ভাগ্য যখন জড়িত হল, তখন রাণী শোকে দুঃখে উন্মত্তবৎ হয়েছিলেন। মায়ের হৃদয় আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করে নিদ্রায়

পর্যন্ত কাতর হয়েছে। সমগ্র নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে রোদন করতে দেখা গেছে। এবং শেষ দৃশ্যে রাণির মৃত্যু আকস্মিক হলেও অসম্ভাবিত নয়; ভীমসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে নিজের হাতে হত্যা না করলেও তাঁরই আদেশে রাজকুমারী আত্মবিসর্জন করেছেন, এবং নাটকে অহল্যা দেবীর শেষ উক্তিঃ –

'মহারাজ তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ আমি তোমার কাছ থেকে এ জন্মের মতোন বিদায় হলেম।' (৫/৩)।

এখানে স্বামীর প্রতি যে অভিমান প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর মধ্যে চরিত্রটির মানবিক পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। নাটকীয় চরিত্র রূপে মহিষীকে কোন ক্রমেই ব্যর্থ বলতে পারি না।

তপস্বিনী চরিত্রটির মধ্যেও এই মানবিকতা লক্ষ্য করা যায়, যদিও বাইরে থেকে সুখে দুঃখে তিনি বিগত স্পৃহা। তিনি বারবার নিজের তপস্বিনী- পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেন, 'আমি চির উদাসিনী। এ ভব সাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না।'(২/১)

কিন্তু সত্য সত্যই তপস্বিনী তাঁর চতুর্পাশ্বস্থ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেননি, বরং উদয় পুরের রাজপরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি প্রধানত রাজমহিষী সখীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন; তাকে সান্ত্বনা, উপদেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। জয়পুরের রাযার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন, আবার যখন জানলেন কৃষ্ণা মরুদেশের রাজা মান সিংহের অনুরাগিণী, এখনও তাতেও উৎসাহবোধ করেছেন। কৃষ্ণকুমারী হৃদয়ের যে গোপন অনুরাগের কথা মাতাকে বলতে পারেনি, তা তপস্বিনীকে বলতে পেরেছে – এখানে তিনি কৃষ্ণার সখীর ভূমিকা নিয়েছেন। অর্থাৎ নাটকের ঘটনা এগিয়ে নিয়ে যেতে গৌণ চরিত্র হিসেবে তাঁর প্রয়োজন আছে। রাজকুমারীর বিবাহ কে কেন্দ্র করে যখন ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হল, তখন রাজপরিবারের অন্য সকলের মতো তপস্বিনীও বিচলিত, কাতর হয়েছেন, তাঁর স্বগত আত্ম বিশ্লেষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য -

'আমি ভেবেছিলাম যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা – এ সকল সংসার মায়া শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধহয় হয় না। আহা এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।(দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয় সকলের বীজ রোপন করেছ, তাদের নির্মূল করা কি মানুষের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল করে ওঠে"।(৩/২)।

লক্ষ্য করতে হবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তপস্বিনী কোন অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেননি, মানবিক সম্পর্ক কেও অস্বীকার করেননি – বরং বৈরাগ্য ও হৃদয় বৃত্তির সংযোগে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত একটি নাটকীয় চরিত্র রূপে তিনি দর্শককে আকর্ষণ করতে থাকেন।

৭.৩ অনুশীলনী

১) কৃষ্ণকুমারী নাটকের গদ্য ভাষা কতখানি ভিন্নতর ছিল সেই সময়কালে আলোচনা কর।

২) কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ নির্মাণে কতখানি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন আলোচনা কর।

৩) কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ চরিত্রের ক্রমবিকাশ কেমন ভাবে ঘটেছে?

৪) মদনিকা ও বিলাসবতী চরিত্রটি নাটকের পরিণতি নির্ধারণে কতখানি ভূমিকা রেখেছে আলোচনা কর।

৫) কৃষ্ণকুমারী নাটকে নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে ব্যক্ত কর।

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকুমারী নাটক- অলোক রায় সম্পাদিত।

৭.৫ উপসংহার

সৃজনশীলতায় ও নতুন আলোড়োনে মাইকেল মধুসূদনের জুড়ি মেলা ভার। একজন মানুষ নিজের ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টি উদ্যমে কি পরিমান মেতে থাকতে পারেন ও কি ভবাএ নিজেকে বারে বারে সেই সৃজন কার্যে একানুরাগী করে তুলতে পারেন, তাই আমাদের বিস্মৃত করে। একজন এত বড় মাপের শিল্পী যিনি কথায় কথায় নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে রেখে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সে তার কুলীনকুলসর্বস্ব দেখে প্রথম নাটক লেখার সূত্রপাত হোক, কিংবা চর্তুদশপদী পদাবলী লেখার সূচীমুখ নির্মাণেই হোক। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।